উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেষ্টার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

কোর পত্র - ১০১

পর্যায় - ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক-১ প্রাচীন যুগ

একক-২ প্রাক্-চৈতন্য যুগ

একক-৩ চৈতন্য যুগ

একক-৪ উত্তর-চৈতন্য যুগ

একক-৫ নাথসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য

একক-৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও মধ্যযুগের মুসলমান কবি

একক-৭ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

পর্যায় খ

একক-৮ আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়

একক-৯ আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায

একক-১০ বাংলা কাব্যে নবযুগ

একক-১১ উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

একক-১২ রবীন্দ্রযুগ

একক-১৩ রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

একক-১৪ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য

কোর পত্র - ১০১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

একক-১

প্রাচীন যুগ- প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি, সংস্কৃত - প্রাকৃত - অপভ্রংশ সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও লিপি, চর্যার ভূমিকা, চর্যাপদের নামকরণ, চর্যাপদের রচনাকাল, চর্যাপদের বুদ্ধবাদ

একক-২

প্রাক্-চৈতন্য যুগ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, মনসামঙ্গল কাব্য

একক-৩

চৈতন্য যুগ- চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, চৈতন্যজীবনী, বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়, বৈষ্ণব পদাবলী

একক-৪

উত্তর-চৈতন্যযুগ- মঙ্গলকাব্যের ভূমিকা, মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, দুর্গামঙ্গল কাব্য, শিবায়ন কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য

একক-৫

নাথ সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য- নাথসাহিত্যের ভূমিকা, গোরক্ষনাথ বৃত্ত, ময়নামতী বা গোপীচন্দ্র বৃত্ত, অনুবাদ সাহিত্য-রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বৈষ্ণব কাব্য

একক-৬

বৈষ্ণব সাহিত্য ও মধ্যযুগের মুসলমান কবি- বৈষ্ণব সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, বাংলায় ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবি, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি

একক-৭

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ-শাক্ত পদাবলী, বাউল গান ও বাউল তত্ত্ব, গাথা ও গীতিকা

একক-১ প্রাচীন যুগ

বিন্যাসক্রম

১.১। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি

১.২। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য

১.৩। বাংলা ভাষা ও লিপি

১.৪। চর্যার ভূমিকা

১.৫। চর্যাপদের নামকরণ

১.৬। চর্যাপদের রচনাকাল

১.৭। চর্যাপদের বুদ্ধবাদ

১.৮। নির্বাচিত প্রশ্ন

১.৯। সহায়ক গ্রন্থ

১.১। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি

এদেশের প্রতি উত্তরাপথের আর্যদের উন্নাসিক আচরণ হ্রাস পেল; পাণিনি-পতঞ্জলির গ্রন্থে, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ-মহাভারত এবং বৌদ্ধ-জৈনগ্রন্থে গৌড়বঙ্গ শ্রদ্ধার আসন লাভ করে।

হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলমান যুগে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা বারবার পরিবর্তিত হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সীমাস্বরূপ এই বিশাল ভূখণ্ডটি এইভাবে নির্ধারিত হয় ঃ- ''উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় থেকে নেপাল, সিকিম, ভূটানরাজ্য। উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ-উপত্যকা; উত্তর পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম- কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।''

মন্তব্য

একসময় এদেশ 'গৌরভূমি' বলে পরিচিত হয়েছিল, পরে মুসলমান যুদ্ধ থেকে এদেশের একাংশ পূর্ববঙ্গের নামানুসারে গোটা ভূখণ্ডটিই 'বঙ্গ', 'বঙ্গালা', 'বঙ্গাল' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হল, পাশ্চাত্য বণিকেরাও এই বাংলাদেশকে ভূগোলে স্বীকার করলেন। রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সবই বঙ্গ-বাংলা নামের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

সেন-শাসনকালে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপর ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের পলিমাটি পড়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব না পড়লে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কিছুতেই লোকসাহিত্যের ওপরে উঠতে পারত না; পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় প্রসারও ঘটত না। সেনবংশের শাসনে এই শুভ লক্ষণটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিক থেকে স্বীকৃতির যোগ্য।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। একসময় এদেশ কী বলে পরিচিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ একসময় এদেশ গৌরভূমি বলে পরিচিত হয়েছিল।

২। কোন্ কোন্ জায়গা বঙ্গ-বাংলা নামের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে?

উত্তর ঃ রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ - এই জায়গাগুলি সবই বঙ্গ-বাংলা নামের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

১.২। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সমস্ত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মূল উৎস, এমনকি দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যেও (তামিল, তেলুগু, মালয়ালি ও কন্নড়) সংস্কৃত প্রভাব অস্বীকার করতে পারেনি। খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী বা তার অল্প কিছু আগে মাগধী অপভ্রংশের আবরণ ত্যাগ করে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। মৌর্য-গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ আদর্শ, সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মার্ত সংস্কারে ব্রাত্য বাঙালির যে দীক্ষা হয়েছিল, সেনযুগে তাই আরো পল্লবিত হয়।

বাংলা সাহিত্য ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বে খ্রিঃ পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, স্মৃতি-পুরাণ, ন্যায়দর্শন, ব্যাকরণ-অভিধান যে এদেশে বিশেষভাবে অনুশীলিত হত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রাচ্যদেশের

ভাষারীতির যে-সমস্ত দৃষ্টান্ত ও বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে গুপ্তযুগেরও আগের থেকে বাংলা ভাষার বিশেষ চর্চা ছিল। মন্তব্য

জয়দেবের কয়েকজন কবিবন্ধু শরণ, উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য। জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে এই বন্ধুদের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে ধোয়ীর 'পবনদূত' ও গোবর্ধন আচার্যের 'গাথাসপ্তশতী' বাঙালির কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছে।

এখানে দুটি সংকলনগ্রন্থের কথা বলা যেতে পারে- 'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়' (সুভাষিত রত্নকোষ) এবং 'সুদুক্তিকর্ণামৃত'।

প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যও বাংলাদেশে কিছু কিছু রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছন্দ শেখাবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল, কিন্তু এতে অনেকগুলি চমৎকার প্রাকৃত-অপভ্রংশ কবিতা আছে - যাতে প্রকৃষ্টভাবে বাঙালি জীবনের ছায়াপাত রয়েছে।

শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের 'দোহাকোষ' চর্যাপদের আলোচনার ভূমিকা হিসাবে উল্লেখ করা যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'ডাকার্ণব', 'দোহাকোষ-পঞ্জিকা' সরোরুহবজ্র ও কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ এবং ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী আবিষ্কৃত তিল্লোপাদের দোহা শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত উত্তর-মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ও সাধনাবিষয়ক পদসংগ্রহ।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। সমস্ত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মূল উৎস কী?

উত্তর ঃ সমস্ত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মূল উৎস সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য।

২। জয়দেবের চারজন কবিবন্ধু কারা?

উত্তর ঃ শরণ, উমাপতি, ধোয়ী এবং গোবর্ধন আচার্য।

৩। দুটি সংকলন গ্রন্থ কী কী?

উত্তর ঃ 'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়' (সুভাষিত রত্নকোষ) এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত'।

মন্তব্য

১.৩। বাংলা ভাষা ও লিপি

বাংলা ভাষা যে মূল ভাষা থেকে জন্ম নিয়ে পূর্বভারতের সমতলভূমির উপর দিয়ে বয়ে গেছে, ভাষার ইতিহাসে তাকে ইন্দোইউরোপীয় ভাষামূল বলা হয়।

বাংলা লিপির উৎপত্তি, বিবর্তন ও পরিণতির ইতিহাস বিস্ময়কর। বাংলা ভাষা যেমন কয়েক হাজার বছর ধরে বহু উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে ঠিক তেমনি বাংলা অক্ষরও নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি সুগঠিত রূপ লাভ করেছে।

ভারতের সমস্ত অক্ষরের আদিজননী হল ব্রাহ্মী লিপি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ইন্দোইউরোপীয় ভাষামূল কাকে বলে?

উত্তর ঃ বাংলা ভাষা যে মূল ভাষা থেকে জন্ম নিয়ে পূর্বভারতের সমতলভূমির উপর দিয়ে বয়ে গেছে, ভাষার ইতিহাসে তাকে ইন্দোইউরোপীয় ভাষামূল বলা হয়।

২। ভারতের সমস্ত অক্ষরের আদিজননী কোনটি?

উত্তর ঃ ভারতের সমস্ত অক্ষরের আদিজননী হল ব্রাহ্মীলিপি।

১.৪। চর্যার ভূমিকা

সাধারণ অর্থে 'চর্যা' কথাটির অর্থ হল যা আচরণীয় বা আচরণযোগ্য।

'মনুস্মৃতি' গ্রন্থে, অনুশীলন অনুষ্ঠান ও পালন অর্থে 'চর্যা' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। 'চর্' ধাতু থেকে 'চর্যা'- এই শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে।

শুধুমাত্র বৌদ্ধসাহিত্যেই নয়, সৎপথ ব্রাহ্মণেও আমরা আচরণীয় অর্থে 'চর্যা' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করছি। আবার পালি ভাষায় 'চর্যা' শব্দটি চরিয়, চরিয়া-এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ- ধম্মচরিয়, ব্রহ্মচরিয়, একচরিয় (বুদ্ধদেবের একাকী অবস্থানের প্রসঙ্গ) ইত্যাদি। এছাড়া 'ভিক্ষাবৃত্তি বলতে ভিক্খাচারিয়, উন্চরিত- এই শব্দগুলির ব্যবহার করা হয়েছে। 'উন্চরিত'- শব্দটি থেকে পরবর্তীকালে 'উঞ্ছবৃত্তি'

শব্দটি এসেছে।

মন্তব্য

সহজযানদের কাছে নক্‌গ্যচরিয় বা নগ্নচর্যা হিসাবে 'চর্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হত। 'খুদ্দকণিকায়' নামক বৌদ্ধগ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের শীর্ষ নাম পাওযা যায় 'চরিয়পিটক' বা 'চর্যাপিটক'।

অর্ধমাগধীতে 'চর্যা' শব্দ হিসাবে আমরা পাই চর্যাসমিতি এবং চরিয়ানিবন্ধ। জৈন তীর্থঙ্করের ছটি কল্যাণ আচরণের বর্ণনা সমন্বিত এবং বত্রিশ প্রকার নাট্যনুষ্ঠানের সমাপ্তিসূচক যে নাট্যকর্ম তাকে চরিয়ানিবন্ধ বলা হয়।

আবার বোধিসত্ত্ব-এর আচরণধারায় চারপ্রকার বিকাশশীল স্তরের সূচক চারটি চর্যা রয়েছে। সেগুলি হল- প্রকৃতিচর্যা, প্রনিধান চর্যা, অনুলোমচর্যা এবং অনিবর্তনচর্যা। অনিবর্তন চর্যা হল সহজচর্যা। পরবর্তীকালে এই অনিবর্তনচর্যা থেকে 'অনাবাটা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 'অনাবাটা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল যে গেল সে আর ফিরে এল না অর্থাৎ গমনধর্মী।

বুদ্ধধর্মে সূত্রশিক্ষা সংক্রান্ত যে ১০টি শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তাকে বলা হয় ধম্মচর্যা। সেগুলি হল ঃ- ১) লেখন, ২) পূজন, ৩) দান, ৪) শ্রবণ, ৫) বাচন, ৬) উদ্‌গ্রহণ, ৭)প্রকাশন, ৮) সাধ্যায়ন, ৯) চিন্তন এবং ১০) ভাবন।

শৈব নাথধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে যে চৌরাশি সিদ্ধা বা ধর্মগুরুর উল্লেখ আছে, এঁদের কেউ কেউ তারই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য এঁদের নামগুলি সবই ছদ্মনাম- তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বা সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এঁরা নিজ নিজ কুলপরিচয়, নামধাম প্রভৃতি পরিত্যাগ করে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। 'চর্যা' কথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'চর্যা' কথাটির অর্থ হল যা আচরণীয় বা আচরণযোগ্য।

২। বোধিসত্ত্ব-এর আচরণধারায় যে চারপ্রকার বিকাশশীল স্তরের সূচক চারটি চর্যা রয়েছে সেগুলি কী কী?

মন্তব্য

উত্তর ঃ বোধিসত্ত্ব-এর আচরণধারায় যে চারপ্রকার বিকাশশীল স্তরের সূচক চারটি চর্যা রয়েছে সেগুলি হল - প্রকৃতিচর্যা, প্রনিধানচর্যা, অনুলোমচর্যা এবং অনিবর্তনচর্যা।

৩। বুদ্ধধর্মে সূত্রশিক্ষা সংক্রান্ত যে ১০টি শিক্ষার কথা বলা হয়েছে সেগুলি কী কী?

উত্তর ঃ ১) লেখন, ২) পূজন, ৩) দান, ৪) শ্রবণ, ৫) বাচন, ৬) উদ্‌গ্রহণ, ৭)প্রকাশন, ৮) সাধ্যায়ন, ৯) চিন্তন এবং ১০) ভাবন।

১.৫। চর্যাপদের নামকরণ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে যেসমস্ত পুঁথি আবিষ্কার করেন, তার মধ্যে যেগুলি তাঁর মতে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত মনে হয়েছিল, সেগুলিকে একত্র করে বাংলা ১৩২৩ সনে (১৯১৬ খ্রিঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ''হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'' এই নামে সম্পাদিত করে তিনি প্রকাশ করেন। এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ঃ', সরহ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং 'ডাকার্ণব'। তিনি সবগুলিকেই প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত মনে করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-ই শুধু প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় লেখা, অন্য তিনখানির ভাষা বাংলা নয়, শৌরসেনী অপভ্রংশের ভগ্নাবশেষ ঐ ভাষার মেরুদণ্ড। পরে এই গ্রন্থ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে - এর ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজদর্শন অতীব কৌতূহলপ্রদ। অবাঙালি পণ্ডিতেরাও (যেমন- রাহুল সাংকৃত্যায়ন) এই গ্রন্থ নিয়ে সমান উৎসাহে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। সংকলনটির যথার্থ কি নাম ছিল তা নিয়েও কিছু বাদ প্রতিবাদ হয়েছে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী একে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বলে গ্রহণ করতে চাননি। বিধুশেখর শাস্ত্রী এর নামকরণ করেছিলেন 'আশ্চর্যচর্যাচয়ঃ'। যাইহোক, ইদানীং এই সংকলন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' (সংক্ষেপে চর্যাপদ) নামে অভিহিত হয়েছে বলে আমরা একে শাস্ত্রী-মহাশয় পরিকল্পিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামেই উল্লেখ করব। যদিও এর প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষ'।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুঁথি আবিষ্কারের পর গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মূল পুঁথিটি আর কোনো গবেষকই ব্যবহার করবার সুযোগ পাননি। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী

Cordier I.P.-এর ক্যাটালগের ভিত্তিতে Stan'gyur Rgyd'grel XLVII. 35, পুঁথি থেকে বাংলা চর্যাপুঁথির একটি তিব্বতী অনুবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর এবং শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'চর্যাগীতি-কোষ' গ্রন্থটির পাঠ নির্ণয়ে তিনি অধ্যাপক শাস্ত্রীর গ্রন্থের সঙ্গে এই অনুবাদ পুঁথিটিরও সাহায্য নিয়েছিলেন। শান্তিভিক্ষু বলেছেন, "I see no justification to invent a new name when the old one conveys the better meaning that is vinicaya- determination of charya that to be practiced and Acharya that not to be practiced."

অধ্যাপক সুকুমার সেন প্রথম চর্যাগীতিগুলির সম্পাদনায় অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী-সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৯৬৬-তে প্রকাশিত 'চর্যাগীতি পদাবলী'র নতুন সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে তিনি অবশ্য এক জাপানী গবেষক-সংগৃহীত মূল চর্যাপুঁথির ফটোমুদ্রণের সুযোগ পেয়েছিলেন। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু এবং তৎপরবর্তী চর্যাপুঁথির গবেষকগণ পূর্বসুরীদের সম্পাদিত গ্রন্থগুলি অবলম্বনেই চর্যাগীতির পাঠ নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন। মূল পুঁথি কেউই পরীক্ষার সুযোগ পাননি।

'চযাগীতিকোষ'- এটি 'চর্যা', 'গীতি' ও 'কোষ' - এই তিনটি পদের সমষ্টি।

চর্যা হল -

''ঈর্যাচ্য কারিকংকর্ম বাচিকং ধর্মদেশনা

সমাদানাং মনঃকর্ম নির্বিকল্পস্য ধীমভঃ'' (অদ্যয়ব্রজসংগ্রহ)

গীতি - Mystic সাধকদের ভাবসঙ্গীতেই গীতি পর্যবসিত হয়। 'ব্রহ্মযান'-এ বজ্রগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বজ্রগীতি ও চর্যাগীতির উদ্দেশ্য একনয়, পৃথক। বজ্রগীতিতে মন্ত্র, জপ ইত্যাদি সকলে পাঠ করতে পারে। কিন্তু চর্যাগীতিতে মন্ত্র, জপ কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদেরই অনুপ্রাণিত করে।

কোষ- মুনি দত্তের টীকায় ১০০ চর্যাগীতি সম্বলিত কোষগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গেছে।

মন্তব্য

কোষ সম্বন্ধে সাহিত্য দর্পকার বিশ্বনাথ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেছেন।

''কোষঃ শ্লোকসমূহস্ত সাদন্যোন্যানাপেক্ষকঃ

বজ্রক্রমেন রচিত ন এবতিমনোরমঃ

অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী অনন্য নিরপেক্ষ মনোরম শ্লোকসমূহই হচ্ছে কোষ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিদ্যাধর-এর 'সুভাষিত রত্নকোষ' এবং 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'-এর কথা।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। চর্যাপুঁথি কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর ঃ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে চর্যপুঁথি আবিষ্কার করেন।

২। বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাগীতির কী নাম দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী চযাগীতির নাম দিয়েছিলেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ঃ'।

৩। চর্যাগীতির প্রকৃত নাম কী?

উত্তর ঃ চর্যাগীতির প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষ'।

১.৬। চর্যাপদের রচনাকাল

চর্যাপদের রচনাকালের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ঃ-

১। অষ্টম শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের রাষ্ট্রীয় পটভূমিতে সহজ মতের প্রতিফলন এবং বহির্ভারতে এই ধর্মের প্রচার ইতিহাস সমর্থন করে যে, চর্যাগীতিগুলি ৮ম-১১০০ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত গৌড়বঙ্গের বিপর্যয় রাষ্ট্র, ধর্ম ও ভাষার পক্ষে যে নামান্তর এনে দিয়েছিল তার প্রমাণ আমরা এখানে পাচ্ছি।

২। ধর্মজগতে বিরাট পরিবর্তন তখন সাধিত হয়েছিল। প্রচলিত

ব্রাহ্মণ্যধর্ম, শাক্তাচার, শৈব হঠযোগ, জৈনধর্মের কঠিন কৃচ্ছসাধনা, তন্ত্রাচার প্রভৃতি সেময়ে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ তন্ত্রযানও তখন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল- বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান।

৩। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজতন্ত্র যখন অব্যবস্থিত, তখন জনগণের দাবিতে সামন্ত রাজারা গোপালকে নির্বাচিত করেন। এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা (epic making event)। এরফলে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিরাপত্তা এসেছিল, রাজার সঙ্গে প্রজার যে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল; ফলে লোকাগ্রিত ধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করলেও তারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের জনক। তাদের সিংহাসন, বজ্রাসন আর সে ব্রজাসনপ্রজ্ঞা উপায় বা শূণ্যতা করুণার যুক্ত প্রতীক। এইসময়ে তাম্রলিপিগুলিতে বজ্রসনের প্রশস্তি পাওয়া যায়-

''সর্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাস্থিতস্য

বজ্রসনস্য বহুমার কুলোপলম্ভাঃ

দেব্যা মহাকরুণায়া পরিপালিতানি

রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশো জয়ন্তি''

৪। গণতান্ত্রিক শাসনের অন্য ফল গণজীবনের অধিকার এবং মূল্যবোধের স্বীকৃতি। চর্যাগানে এই স্বীকৃতির সাক্ষর আছে। নিম্নবর্ণের ডোম, মাতঙ্গী, শবর এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। জনগণের ভাষার মূল্যবোধ স্বীকৃত হয়েছে। যে লোকাশ্রিত ভাষা অভিজাত সংস্কৃত ভাষার চাপে অপাংক্তেয় ছিল পালরাজাদের যুগে সেই ভাষা বিকশিত হয়েছিল।

৫। চর্যার ভাষা সংক্রান্তিকালের ভাষা বহন করে। এই ভাষা সদ্য অপভ্রংশ কোষমুক্ত ভাষা। পণ্ডিতেরা ৬০০-৯০০ খ্রিঃ অপভ্রংশ ভাষার সীমা বলে নির্ধারণ করেছেন। ইতিহাসবিদ্ প্রভাতাংশু মাইতি বলেছেন, "The vernacular of bengal developed a prompt bengali form during the reig of Dharmapala."

মন্তব্য

৬। চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল যে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী সে সম্পর্কে আরেকটি সাক্ষ্য চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইতিহাস। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চীনদেশের যোগ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কুমারজীবের সময় থেকে (খ্রি. ৫ম) চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা হয়। চীনারা এই মতকে কনফুসিয় ও তাও ধর্মের সাথে মিলিয়ে নেয়। আচার্য বোধিধর্ম ষষ্ঠ শতকে এই শাখাকে বিস্তার করেন। এরপর সপ্তম শতকের মধ্যভাগে হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষ থেকে ফিরে চীনদেশে যোগাচার বিজ্ঞানবাদ প্রচার করেন।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ও আলোচনার দ্বারা চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যায়, যা চর্যাপদের আলোচনায় অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। চর্যাগীতিগুলি কোন্ সময়ে রচিত?

উত্তর ঃ চর্যাগীতিগুলি ৮ম-১১০০ শতাব্দীর মধ্যে রচিত।

২। বৌদ্ধ তন্ত্রযানের বিভিন্ন নামগুলি কী কী?

উত্তর ঃ বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান।

৩। পণ্ডিতেরা কখন অপভ্রংশ ভাষার সীমা বলে নির্ধারণ করেছেন?

উত্তর ঃ পণ্ডিতেরা ৬০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দকে অপভ্রংশ ভাষার সীমা বলে নির্ধারণ করেছেন।

১.৭। চর্যাপদের বুদ্ধবাদ

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও প্রসারণ বিচার করলে একথা মানতেই হবে যে, এই ধর্মমতকে বিশ্বধর্মও বলা যেতে পারে। যদিও ভারতবর্ষের একটি বিশেষ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু এই ধর্মের মূলে নিহিত বিশ্বতোমুখী অনুপ্রেরণার জন্য এদেশের

বৌদ্ধধর্ম সিংহল-ব্রহ্ম-শ্যাম-কম্বোজ, তিব্বত-চীন-জাপানে প্রবেশ করে। সে দেশের ধর্মবিশ্বাসকে কখনো গ্রাস করে, কখনো বা সে দেশের সাধনার সঙ্গে মিশে গিয়ে নতুন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিবর্তন নিম্নে আলোচিত হলো ঃ-

১। বৌদ্ধবাদে তর্কবিদ্যার প্রাধান্য আছে। সুতরাং, যে যত প্রকাশে কুশল হবেন তিনি ভুল বললেও তকে জয়ী হবেন, কিন্তু যিনি প্রকাশে অক্ষম তিনি ঠিক বললেও জয়ী হবেন না।

২। মূক্-বধির গুরুশিষ্য চর্চা। হীনমান, মহাযান, বজ্রযান, সহজযান এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়েও থেরোবাদ, অভিধর্মবাদ এবং মহাযানের উদ্ভব-বিকাশের নানা পর্যায় চর্যার মাধ্যমে অনুশীলন করলে বুদ্ধ দর্শনমূল অনুভব করা যায়। যেমন - জলে চাঁদ যেমন সত্য নয়, আবার মিথ্যাও নয়; বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ নিজেই হলেন চাঁদ আর জলের মধ্যে চাঁদ আয়নার প্রকাশ। এই আয়না আমাদের মনের মধ্যে প্রতিবিম্ব তৈরি করছে।

৩। শূণ্যতা। চর্যাগীতিতে 'শূণ্যতা' এই পারিভাষিক শব্দটি বারবার এসেছে। যেমন - শূণ্য তরুবর, শূণ্য তন্ত্রীধ্বনি, শূণ্য প্রান্তর, শূণ্য বাসগৃহ, শূণ্য মেয়েমহল, শূণ্যতাধ্বনি, শূণ্যরূপ নৈরাত্মা। এই ভাবনার মূলে আছে দ্বিতীয় দশকের মহাযান দর্শন। হৃদয়সূত্র ও হীরকসূত্র- এই পুঁথি দুটির কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

৪। চর্যার ভাবনায় 'মায়া' শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে। 'মায়া'র উল্লেখ ১৩, ৪৬, ১৫, ৫০ নং গানে আছে। ভানুমতীর খেলায় যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয় তাই হচ্ছে 'মায়া'। ১৩ এবং ২৩ নং পদে আছে মায়াজাল। ২৩ নং গানে আছে মায়াহারিণী, ১১নং গানে মায়াকে মেয়ে কাহ্ন কাপালিক হল বলা হচ্ছে। এই মায়া কিছুই না মূর্তিমতি অবিদ্যা। মহাযান দর্শনের চরম সত্য হল 'শূণ্যতা'। বৌদ্ধ শূণ্যতা নেতিবাচকতায় চিহ্নিত। বৌদ্ধদর্শনের শূণ্যতার ২০ রকম ব্যখ্যা হয়েছে। আমরা এখানেও শূণ্যতার নানা ব্যখ্যা পাচ্ছি।

৫। মহাযান দর্শনে শূণ্যতার প্রতিশব্দ হল 'তথতা', মানে চিরন্তনভাবে

মন্তব্য

এরকম বাস্তবতা নয়। যেন ঢেউ নয়, অথচ সমুদ্র। এর পারিভাষিক প্রয়োগ আছে ৯, ৩৬, ৪৪ নং গানে। ১৭ নং গানে শূণ্যতাকে Emptyness, Voidness ও Nothingness দিয়ে বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে। 'তথতা'কে Suchness ও Thusness দিয়ে বোঝানো হয়েছে। বৌদ্ধ ভাবনায় তথতা বা শূণ্যতা হল বুদ্ধ-স্বভাব। মহাযান ভাবনায় এই শূণ্যতার শিক্ষা আপেক্ষিক উপাসক তার মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী শূণ্যতাকে অধীনত করে। শূণ্যতার ধারণা থেকে মহা করুণার উদ্ভব ঘটে। চর্যাগানে একে করুণা বলা হয়েছে। শূণ্যতার করুণার যোগসাধনের উপায় খোঁজা হয়েছে।

৬। চর্যাগীতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে নৈতিকতার সমস্যার কোনো সমাধান মেলে না। শরীরী মিলনের অবিরল অকুণ্ঠিত উল্লেখ শারীরীক ক্রিয়াকর্মের অবাধিত প্রসঙ্গ চর্যাপদের বিষয় হয়েছে। ভারতীয় বৌদ্ধরা শরীরী সম্পর্কের কথা শান্ত অবলীলায় বলেন। কিন্তু, চিন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপানে উচিত্য বিচারে এটি আলোচিত হয় না। আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি শব্দ ধর্মগ্রন্থে থাকা নিয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা গেছে। বৌদ্ধদের সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী এটি অনৈতিক নয়। অন্তরঙ্গ বুদ্ধবাদে এরকম বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৭। আদি বৌদ্ধদের মধ্যে ধ্যান, যোগ, সমাধির প্রচলন ছিল। কিন্তু যোগসাধনা ছিল পরিণততম সাধকদের অবলম্বন। তান্ত্রিক হঠযোগের সাধনা তাদের অভ্যাসকে আরো দৃঢ় করেছিল। চর্যাগানে তাই যোগী, যোগিনী শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। চর্যাগানে প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনরূপে 'ক্ষমতাযোগে' পদবন্ধুটি ব্যবহৃত হয়েছে। ক্ষমতা আদি ব্রহ্মদর্শনে ব্যবহৃত একটি প্রত্ন-শব্দ। ধ্যানী ও নির্মাণকামী আদি বৌদ্ধদের কাছে ক্ষমতা ছিল একটি অবস্থা যেখানে মানসিক ক্রিয়া লোপ পায় আর চিত্ত অবিচলতি থাকে।

৯। বৌদ্ধদের কাছে যেকোনো শিক্ষাই শিল্প। চর্যাগীতির ধর্ম, কাব্য, সঙ্গীত সবই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধধর্ম প্রকাশের সংবেগ সব বুদ্ধবাদী রচনার মূলে স্বাভাবিকভাবে সমান ক্রিয়াশীল ছিল না। যখন আবার বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক পতন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রমিক পুনরুত্থান ঘটছে সেইসময়ে বৌদ্ধ রচনায় অ-বৌদ্ধ উপাদান স্থান

পেয়েছে; যাতে বৌদ্ধ দার্শনিক পরিভাষার প্রয়োগ নেই। চর্যাগীতি এই পর্যায়ের রচনা। মন্তব্য
ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত বৌদ্ধ কবি এই সময়ে মারবিজয় স্তোত্র নামে একটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন, যা বহুল প্রচলিত হয়েছিল।

১০। ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিক বিশ্বাস দুই বজ্রযানের অঙ্গীভূত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। বৈদিক হোম, যজ্ঞ এখানে নেই। বজ্রযানী বৌদ্ধরা মন্ত্রঃপুত ধারনীতে বিশ্বাস করতেন।

১১। চর্যাগীতিতে বোধিচিত্ত পথটি নেই কিন্তু বোধি ও চিত্ত শব্দ দুটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। বোধির অর্থ প্রজ্ঞা ও করুণার সহযোগে বোধিসত্ত্বের চরিত্রের আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। চর্যাগীতি এই প্রবন্ধটি দিয়ে শূণ্যতার সঙ্গে করুণাকে মিলিয়েছে।

১২। অন্তরঙ্গ বুদ্ধবাদের যাত্রা প্রতীকবাদের দিকে। চর্যাগীতি প্রতীকের ভাণ্ডার। এখানে তত্ত্ব কীভাবে প্রতীকে রূপায়িত হচ্ছে তার আকর্ষণ কম নয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রতীকের আরোপন প্রথম থেকে ছিল। যদিও চর্যাগীতি এই গণনাকে গ্রহণ করেনি।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। বুদ্ধবাদে কীসের প্রাধান্য আছে?

উত্তর ঃ বুদ্ধবাদে তর্কবিদ্যার প্রধান্য আছে।

২। চর্যাগীতিতে কোন্ পারভিাষিক শব্দটি বারবার এসেছে?

উত্তর ঃ চযাগীতিতে 'শূণ্যতা' শব্দটি বারবার এসেছে।

৩। ১৭নং গানে শূণ্যতাকে কী দিয়ে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ Emtyness, Voidness ও Nothingness দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

৪। 'তথতা' কে কী দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

উত্তর ঃ Suchness ও Thusness দিয়ে 'তথতা'-কে বোঝানো হয়েছে।

মন্তব্য

১.৮। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে কী জানো?

২। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য কী?

৩। চর্যাপদের নামকরণ ও রচনাকাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

৪। 'চর্যাপদে বুদ্ধবাদ'- কতটা যুক্তিযুক্ত আলোচনা করো।

১.৯। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়) - ভূদেব চৌধুরী।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) - সুকুমার সেন।

একক-২ প্রাক্-চৈতন্য যুগ

বিন্যাসক্রম

২.১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

২.২। অনুবাদ সাহিত্য

২.৩। মনসামঙ্গল কাব্য

২.৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

২.৫। সহায়ক গ্রন্থ

২.১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন। এটি বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই গ্রন্থটি রচিত হয়। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং তাঁর সম্পাদিত এই পুঁথি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মূল নাম পুঁথিটির কোথাও পাওয়া যায় নি। গ্রন্থের প্রথম, মধ্য ও শেষের দিকের কটা পাতা নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায়। গ্রন্থটির মধ্যে একটা বিচ্ছিন্ন কাগজ পাওয়া যায় যাতে এই বইকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব' বা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক প্রথম কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। যে রাধাকৃষ্ণের কথা অবলম্বন করে বাংলায় বৈষ্ণব পদসাহিত্য অপরূপ সমৃদ্ধ ও বাঙালির প্রাণ অনন্য বিকশিত হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থ তার প্রথম প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষা আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার একমাত্র আদর্শ নিদর্শন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "Origin and Development of the Bengali Language" গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ড. সুকুমার সেনও এই কথা বলেছেন।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কে কোথা থেকে আবিষ্কার করেন?

উত্তর ঃ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন।

২। গ্রন্থটি আর কী নামে পরিচিত?

উত্তর ঃ 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব' বা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'।

২.২। অনুবাদ সাহিত্য

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

কৃত্তিবাসের পুঁথিতে কবির একটা আত্মবিবরণী আছে যে অংশটির প্রামাণ্যতা নিয়ে অনেক সংশয় আছে। তবে সমালোচকেরা একে যথার্থ বলে মনে করেছেন। কারণ এতে লিপিকরদের হস্তাবলেপ থাকলেও এর মধ্যে যে ঐতিহাসিক উপাদান আছে তার মূল্য অনেক।

পূর্বেতে বেদানুজ মহারাজার এক পাত্র ছিলেন নরসিংহ ওঝা। কৃত্তিবাস ছিলেন বিদ্বান বুদ্ধিমান। বারো বছর বয়সে তিনি উত্তর দেশে পড়তে গেলেন। সম্যক বিদ্যালাভ করে তিনি দেশে ফিরলেন।

কৃত্তিবাস ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী এবং অপরিসীম কবিত্বশক্তি সম্পন্ন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভক্তিরসে নিবিড় নিমগ্ন। ভক্তিভাবনার মধ্যে যে পুণ্যতা, যে পবিত্রতা, যে আত্মব্যাকুলতা আছে কৃত্তিবাসের রামচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে তা সার্থক রূপ পেয়েছে।

রামায়ণ সে যুগের - বলা ভালো চিরযুগের বাঙালী জীবনের দলিল হয়ে উঠেছে। বীর্যবত্তা সত্ত্বেও রাম বাঙালি পরিবারের অগ্রজের মতো উদার সহৃদয় প্রেমপরায়ণ।

বাংলার প্রকৃতি, পরিবেশ সবই ফুটে উঠেছে কৃত্তিবাসের রামায়ণে। বাংলার প্রকৃতির ছবি তিনি এঁকেছেন - রামায়ণের অরণ্য, নদী যেন বাংলারই বন এবং তটিনী। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রামায়ণে কোন্ মূল্য অনেক?

উত্তর ঃ ঐতিহাসিক উপাদানের মূল্য।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

মূলত কৃষ্ণলীলাই এর বর্ণিত বিষয়, অন্যান্য প্রসঙ্গও আছে। বেদব্যাসের ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ বা পর্বে বিন্যস্ত যাতে ৩৩২ টি অধ্যায় ও ১৮০০ শ্লোক আছে। এই গ্রন্থের দশম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও পরবর্তী লীলা বর্ণিত হয়েছে।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটি 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। তিনটি নামেই শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দের বিজয়ের কথা এবং তাঁর মঙ্গলদায়ী শক্তির কথা বলা হয়েছে। কাব্যগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিপ্রদায়ী - বীর্যবান রূপ প্রকাশ পেয়েছে; কবি যেন এই চিত্রণের দ্বারা বাঙালি জাতিকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন শক্তিতে সাহসে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে বাংলার জীবন ও প্রকৃতি যেন সম্যক প্রকাশিত হয়েছে; বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকার জীবন কোনো মায়াবী স্পর্শে বাংলার জীবনে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই বাংলার মানসিকতা, বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি বাংলা অন্নব্যঞ্জনই আন্তরিক হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হয়েছে স্বয়ং বাঙালি বালক।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি কে রচনা করেন?

উত্তর ঃ মালাধার বসু।

২। বেদব্যাসের ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে বা পর্বে কয়টি অধ্যায় ও কয়টি শ্লোক আছে?

মন্তব্য

উত্তর ঃ ৩৩২ টি অধ্যায় ও ১৮০০ শ্লোক আছে।

মহাভারতের অনুবাদ

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঃ-

তাঁর রচিত মহাভারতের অনুবাদকেই এই মহাকাব্যের প্রথম বাংলা সৃষ্টিরূপে অভিহিত করা হয়। তাঁর এক 'লস্কর' পরাগল খাঁ চাটিগ্রাম অর্থাৎ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মহাভারতের গল্প শুনে আকৃষ্ট হন এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে 'দিনেকে' শোনার মতো করে অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত আকারে মহাভারত রচনা করতে বলেন।

কাশীরাম দাস ঃ-

কাশীরাম দাস বাংলা মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। প্রায় চারশ বছর ধরে কাশীরাম বাঙালি মানসে সগৌরব মহিমায় বিরাজিত।

কাশীরাম দাস ছিলেন দেব উপাধি সম্পন্ন। কিন্তু বৈষ্ণব মানসিকতার জন্য কবি দেব উপাধি পরিত্যাগ করে নম্রতাসূচক দাস পদবী গ্রহণ করেন।

কাশীরাম দাসের অষ্টাদশ পর্বে বিন্যস্ত মহাভারত অত্যন্ত ঋদ্ধ রচনা। বিশালকার ধ্রুপদী কাব্য বাংলায় সার্থক রূপ পেয়েছে। কাশীরামের পাণ্ডিত্য ও মনীষার সমন্বয় বাংলা মহাকাব্যকে চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কবীন্দ্র পরমেশ্বর কার নির্দেশে মহাভারত রচনা করেন?

উত্তর ঃ পরাগল খাঁর।

২। মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা কে?

উত্তর ঃ কাশীরাম দাস।

২.৩। মনসামঙ্গল কাব্য

মন্তব্য

বাংলাদেশ চিরকালই নদীমাতৃক দেশ। বিশেষত পূর্ববঙ্গ বহু নদী অধ্যাষিত এবং সর্পসঙ্কুলও বটে। মনসা সর্পের দেবী, সর্পভূষণা, তাঁর অনুচর অনুচরী বিষধর নাগ-নাগিনী।

মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের দেবী মনসার মাহাত্ম্যকথা ও পূজা প্রচারের কাহিনি প্রধানত বর্ণিত হয়েছে। লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই তাঁর আবির্ভাব। মনসা পৌরাণিক দেবী নন, মনসামঙ্গল কাব্যে শিবের মানস কন্যা রূপে এবং শিবপত্নী চণ্ডীর সান্নিধ্যে তাঁকে পৌরাণিক দেবীরূপে গ্রহণের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

যে যুগের মানুষের ধর্মবিশ্বাস, সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সমাজে বর্ণবিভাগ ইত্যাদির যেসব পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল ঃ-

১। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে শৈব ধর্মের আধিপত্য।

২। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বণিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল, তাঁর ধনী এবং অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

৩। ব্যবসা বাণিজ্যের বিবরণ।

৪। নৌ-বাণিজ্য যাত্রার আগে পূজা পার্বণ ও বিশেষ আচার অনুষ্ঠান করা হত।

৫। বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

৬। সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল।

৭। অলৌকিক বিস্ময়ের প্রতি মানুষের অন্ধবিশ্বাস ছিল।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। সেযুগের সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবরণ।

মন্তব্য

২.৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মূল্য কতটা তা নিরূপণ করো।

৩। মনসামঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

২.৫। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

২। বঙ্গভূমিকা - সুকুমার সেন।

৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-৩ চৈতন্য যুগ

বিন্যাসক্রম

৩.১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

৩.২। চৈতন্যজীবনী

৩.৩। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী

৩.৪। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত

৩.৫। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

৩.৬। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

৩.৭। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৩.৮। গোবিন্দদাসের কড়চা

৩.৯। চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়

৩.১০। বৈষ্ণব পদাবলী

৩.১১। নির্বাচিত প্রশ্ন

৩.১২। সহায়ক গ্রন্থ

৩.১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডীর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সুদূর অতীতেও তিনি বিদ্যমান ছিলেন। পিতৃতান্ত্রিক ছিল আর্যদের সমাজ, যেখানে পুরুষ দেবতাদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু নারীদেবতারাও সেখানে গুরুত্ব পেয়েছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে দুটি কাহিনি আছে। একটি হল আখেটি খণ্ড, অপরটি হল বণিক খণ্ড। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী; দ্বিতীয়টি ধনপতি ও খুল্লনা-লহনার কাহিনী। প্রথম গল্পের মধ্যে অনার্য ব্যাধ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গল্প অপেক্ষাকৃত উচ্চসমাজের গল্প। সংস্কৃত পুরাণের অর্বাচীন অংশে এই দুয়েরই উল্লেখ আছে।

মন্তব্য

মানিক দত্ত ঃ

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি বলে পরিচিত মানিক দত্তের নামে প্রচলিত একটি মাত্র হস্তলিখিত পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। এর প্রথমাংশের একটি ও শেষের দিকে কয়েকটি পাতা নেই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে তা থেকে মনে হয় যে এদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্বেই এই কাহিনিটি রচিত হয়েছিল।

দ্বিজ মাধব ঃ-

চণ্ডীমঙ্গলের অপর একজন মুকুন্দ-পূর্ববর্তী কবি হলেন দ্বিজ মাধব। ইনি মাধব আচার্য নামেও পরিচিত। তবে মাধব আচার্য নামে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা অপর এক কবির অস্তিত্বের ফলে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। দ্বিজমাধব চণ্ডীমঙ্গলের প্রারম্ভিক বন্দনাভাগে যে কবি-পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধব আচার্যের অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ-

মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দরাম। মঙ্গলকাব্যের পুচ্ছগ্রহিতা ছেড়ে মৌলিকতা ও আপন প্রতিভা বলে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। যদিও কবির প্রচলিত নাম মুকুন্দরাম তবুও কারুর কারুর মতে তাঁর যথার্থ নাম মুকুন্দ চক্রবর্তী। কবিকঙ্কণ তাঁর উপাধি। কবির কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল' যা চণ্ডীমঙ্গল নামেও পরিচিত। কবির কাব্য দুই খণ্ডে বিভক্ত - ব্যাধখণ্ড ও বণিকখণ্ড।

চণ্ডীমঙ্গলের আর এক কবি রামানন্দ যতি। 'বুদ্ধাবতার' রচয়িতা রামানন্দ ঘোষ এবং তিনি এক ব্যক্তি কেউ কেউ তা বলেন। রামানন্দ যতির চণ্ডী কাব্যে কবি নিজেই মুকুন্দরামের কাব্যের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা করে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন। বিক্রমপুরের বাসিন্দা লালা জয়নারায়ণ ছাড়াও অতিরিক্ত আরো কিছু কথা ও কাহিনি আছে। কবি ভবানীশঙ্কর ছিলেন চট্টগ্রামের কবি। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয় অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ পাদে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

মন্তব্য

১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তিনজন বিখ্যাত কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

২। মুকুন্দ চক্রবর্তীর উপাধি কী?

উত্তর ঃ কবিকঙ্কণ।

৩.২। চৈতন্যজীবনী

চৈতন্যদেব ছিলেন বৈষ্ণবভাবনার বিশেষ গৌড়ীয় তত্ত্ব ও দর্শনের এক প্রমূর্ত বিগ্রহ। তাই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব শাস্ত্রকাররা যখন বৈষ্ণব তত্ত্বকে রূপ দিতে চেয়েছেন তখন অনিবার্যভাবে সেই আদর্শের ভাবমূর্তি চৈতন্যজীবনে রূপায়িত হয়েছে।

দেবোপম মানুষটিকে কেন্দ্র করে লেখকদের যে ব্যক্তিগত উপলব্ধি ছিল, যে জীবনাকুতি তাঁরা অনুভব করেছেন তা ব্যক্ত করার জন্যই এই সাহিত্য।

শ্রীচৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে চৈতন্য জীবনকথা যথাযথ রচিত ও রক্ষিত হয়েছে। এগুলোকে বলা যায় যাথার্থ জীবনসাহিত্য বা Biography। অবশ্য এদের সাধারণ জীবনীসাহিত্য না বলে Hagiography বা সাধুসন্তদের জীবনকথা বলাই সঙ্গত।

এই গ্রন্থগুলির রচনার দ্বারা দেখা গেল যে একজন প্রত্যক্ষ মাটির পৃথিবীর মানুষ এই প্রথম বাংলা সাহিত্যের বিষয় হলেন।

তদানীন্তন বাংলাদেশের সামাজিক ঐতিহাসিক পরিচয় চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলিতে পাওয়া যায় ঃ এগুলি হয়ে উঠেছে কালের দলিল।

এই জীবনীগ্রন্থগুলি হবার ফলে বাংলা ভাষা সুগঠিত হল, কাব্যভাষার মধ্যে এল মননশীলতা ও মেধাবী বোধ। মহিমান্বিত চৈতন্য জীবন ও সুগভীর বৈষ্ণব দর্শন যথাযথ প্রকাশ করায় প্রায় নবসৃজ্যমান বাংলা ভাষা বিশেষ ঋদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে, তার অদম্য প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটে।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। জীবনীসাহিত্যের ইংরেজি পরিভাষা কী?

উত্তর ঃ Biography।

৩.৩। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী

সনাতন, রূপ, জীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট - মূলত এঁরাই বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী নামে পরিচিত; কৃষ্ণদাস কবিরাজকে ধরলে এঁদের সংখ্যা হবে সাত।

সনাতন, রূপ ও জীব - প্রধানত এঁদের গ্রন্থেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। রঘুনাথ ভট্ট বিশেষ কোনো গ্রন্থ লিখে যাননি। তাঁর পুন্যশীল জীবনাদর্শই তাঁকে বৃন্দাবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোস্বামীতে পরিণত করেছিল। 'স্তবমালা', 'মুক্তাচরিত্র', 'দানকেলিচিন্তামণি' প্রভৃতি কাব্যে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় কাব্যরচনার অসাধারণ শক্তি প্রমাণিত হয়েছে। চৈতন্যভক্ত গোপাল ভট্টও বৃন্দাবন-সমাজে প্রসিদ্ধ আচার্য ও ভক্তরূপে সম্মানিক ছিলেন।

বৃন্দাবনের যে তিনজন গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করে আবেগের ধর্মকে সুদৃঢ় মননের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁরা হলেন জ্যেষ্ঠ সনাতন, তদনুজ রূপ এবং তাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র সুবিখ্যাত জীবগোস্বামী।

সনাতনের ছোটো ভাই রূপগোস্বামী গৌড়েশ্বরের উচ্চ রাজকর্মচারী হলেও মহাপ্রভুর দর্শনলাভের পর জষ্ঠ্যের আগেই গৃহত্যাগ করেন এবং প্রয়াগে মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হন।

রূপ-সনাতন-জীব বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁরা গ্রন্থাদি রচনা করে চৈতন্যমার্গের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা না করলে বাংলা বৈষ্ণবধর্ম উপধর্ম হয়েই থাক- দেশব্যাপী গৌরব ও মহিমা লাভ করতে পারত না।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী কারা?

উত্তর ঃ সনাতন, রূপ, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট।

মন্তব্য

৩.৪। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রথম রচিত হল বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। এই গ্রন্থের নাম প্রথমে ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল', কিন্তু লোচনদাস অব্যবহিত পরবর্তীকালে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে আর একটি জীবনীগ্রন্থ লেখায় বৃন্দাবনদাসের জননীর নির্দেশে গ্রন্থের নাম পরিবর্তিত করা হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত - আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদিখণ্ডে আছে পনেরটি অধ্যায়, মধ্যখণ্ডে ছাব্বিশটি এবং অন্ত্যখণ্ডে দশটি অধ্যায়। তবে অন্ত্যখণ্ডটি অসম্পূর্ণ, চৈতন্যজীবনের শেষ অধ্যায়টি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়নি, চৈতন্যজীবনের অন্তিম পর্যায়টি যেন আকস্মিকভাবে পরিসমাপ্ত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের আদি ও মধ্যকালের অনুপম জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। বাল্যকালের চঞ্চল, চপল অথচ তীক্ষ্ণধী পরিচয়, মধ্যকালের গৌড় ভ্রমণ কথা ও পবিত্র ধর্মাচরণ, পরবর্তীকালের অধ্যাত্মভাবময় জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে সুন্দরভাবে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। চৈতন্যভাগবত কয়টি খণ্ডে বিভক্ত ও কী কী?

উত্তর ঃ তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত - আদি, মধ্য ও অন্ত্য।

৩.৫। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

নরহরি সরকার 'গৌড়নাগর' ভাবের প্রবক্তা ছিলেন। এই ভাব অনুযায়ী গৌর বা গৌরাঙ্গ ছিলেন নাগর অর্থাৎ প্রেমিক, ভক্তেরা হলেন নাগরী বা প্রেমিকা। শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শেই এই মত গড়ে ওঠে। লোচনদাসও এই মতের অনুসারী ছিলেন। তাঁর 'ধামালী' বিষয়ক পদগুলির এই ভাবেরই প্রকাশ আছে। 'ধামালী' কথার অর্থ রঙ্গ পরিহাস এবং হালকা চালে চটুল ছড়ার মতো ঈশ্বরীয় ভাবকে ব্যক্ত করা।

মন্তব্য

লোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' চার খণ্ডে বিভক্ত। সেই খণ্ডগুলি হল - সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং অন্ত্যখণ্ড।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' কে রচনা করেন?

উত্তর ঃ লোচনদাস।

২। 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-এর চারটি খণ্ড কী কী?

উত্তর ঃ সূত্র খণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং অন্ত্যখণ্ড।

৩.৬। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

আনুমানিক ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ নয়। কবির মূল লক্ষ্য ছিল পাঠক বা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা; তাই তিনি সুন্দরভাবে গল্প বলেছেন, চৈতন্যজীবনকে নিয়ে মনোরম কাহিনি বলেছেন; অলৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনিকে ব্যক্ত করেছেন; সঙ্গীতদক্ষ কবি বিভিন্ন রাগরাগিনীর প্রয়োগ করেছেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। 'চৈতন্যমঙ্গল' কে রচনা করেছেন?

উত্তর ঃ জয়ানন্দ।

২। 'চৈতন্যমঙ্গল' কয়টি খণ্ডে বিন্যস্ত?

উত্তর ঃ নয়টি খণ্ডে।

৩.৭। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মন্তব্য

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীচৈন্যচরিতামৃত' শ্রেষ্ঠ চৈতন্য জীবনীকাব্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রতিভা সম্যক প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। গ্রন্থটি আদি মধ্য ও অন্ত্য তিনটি লীলায় বিভক্ত। আদিলীলায় সতেরটি পরিচ্ছেদ আছে।

মধ্যলীলায় আছে পঁচিশটি পরিচ্ছেদ। এখানে আছে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ, নীলাচল যাত্রা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, সার্বভৌম রামানন্দ প্রমুখের সঙ্গে অচলাচনা, বৃন্দাবন কাশী প্রভৃতি স্থান অবস্থান, পথে রাঢ়দেশে আগমন, পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনা।

কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলা। চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের লীলা কথা এখানে বিশদ বর্ণিত হয়েছে যে অপার্থিব জীবনের কথা শোনাবার জন্য ভক্তরা ব্যাকুল হয়েছিলেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর অন্ত্যলীলা কটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত?

উত্তর ঃ কুড়িটি পরিচ্ছেদে।

৩.৮। গোবিন্দদাসের কড়চা

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের কথা বা বৃত্তান্ত গোবিন্দদাস কড়চা বা দিনলিপির আকারে লিখে রাখেন। তিনি বলেছেন - 'কড়চা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে'। কড়চা কথাটির অর্থ দিনলিপি বা diary। কিন্তু গোবিন্দদাসের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি, গোবিন্দদাস কর্মকার নামক কোনো ব্যক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ আলোচনায় 'গোবিন্দদাসের কড়চা' কোনো গুরুত্ব পাবেনা বলেই মনে হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। 'কড়চা' কথার অর্থ কী?

মন্তব্য

উত্তর ঃ দিনলিপি বা diary।

৩.৯। চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়

ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' (১৯৫৭) এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের খণ্ডিত পুঁথি মাত্র পাওয়া গেছে। কথিত অন্য দুটি খণ্ড পাওয়া যায়নি। মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটি লেখা হয়েছিল।

চূড়ামণি দাস ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কোন্ সময়ে 'গৌরাঙ্গবিজয়' লেখা হয়েছিল?

উত্তর ঃ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।

৩.১০। বৈষ্ণব পদাবলী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রধানত গীতিকবিতার মধ্য দিয়ে যে অধ্যাত্মচেতনার অপরূপ বিকাশ ঘটেছে তা বৈষ্ণব পদাবলী। বাংলার বৈষ্ণব কবিরা নির্মাণ করেছেন হৃদয়ের ঋক্ চন্দনে দীপজ্যোতিতে শোভিত শিল্পের স্রগ্ধর অর্থাৎ মাল্যভূষিত রূপ যা বিশেষভাবেই চৈতন্যদেবের স্পর্শে দিব্য সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বৈষ্ণব ভাবনার সঙ্গে সুফীতত্ত্বের মিল অনেক ক্ষেত্রেই আছে। প্রকৃতপক্ষে সুফীতত্ত্বের মূল কথাই হল 'প্রেম'। তাঁরা মনে করেছিলেন - প্রেম সেই এক। মানুষের আধারে ধরলে মানবিক, ঈশ্বরের আধারে ধরলে ঐশ্বরিক। মানবিক আধারে রাখলে শেষপর্যন্ত অনর্থ, ঐশ্বরিক আধার খুঁজে পেলে পরমার্থ।

বৈষ্ণব পদাবলী উল্লেখযোগ্য কবি হলেন- বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

মন্তব্য

১। সুফীতত্ত্বের মূল কথা কী?

উত্তর ঃ সুফীতত্ত্বের মূল কথা প্রেম।

২। বৈষ্ণব পদাবলীর উল্লেখযোগ্য কবি কারা?

উত্তর ঃ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ।

৩.১১। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বলতে কী বোঝ?

২। চৈতন্যজীবনী ও বৃন্দাবনদাসের ষড়গোস্বামী সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে কী জানো।

৩.১২। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-৪ উত্তর-চৈতন্যযুগ

বিন্যাসক্রম

৪.১। মঙ্গলকাব্যের ভূমিকা

৪২। মনসামঙ্গল কাব্য

৪.৩। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

৪.৪। দুর্গামঙ্গল কাব্য

৪.৫। শিবায়ন কাব্য

৪.৬। ধর্মমঙ্গল কাব্য

৪.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

৪.৮। সহায়ক গ্রন্থ

৪.১। মঙ্গলকাব্যের ভূমিকা

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবর শাহের মৃত্যু- যিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর বিচিত্র ঐশ্বর্যমণ্ডিতরূপে স্থাপন করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগেই বাংলাদেশের স্থানীয় সামন্তেরা হতবল হয়ে পড়লে এদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান হতে শুরু করল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাক্কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক্কাল - আকবরের মৃত্যু থেকে ঔরংজেবের মৃত্যুর মধ্যে বাংলার ভাগ্যাকাশে অনেক তারকার উত্থান ও পতন হয়েছে। আকবরের পরে জাহাঙ্গীরের শাসনকালে বাংলার বারো ভুঁইয়াদের শক্তি ধূলিস্মাৎ হল ঃ শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও কুচবিহার - রাজাদের স্বাতন্ত্র্যও লুপ্ত হয়ে গেল। ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ বাংলার সুবাদার হয়ে এসে অতি অল্পদিনের মধ্যে মুঘল-অধিকৃত বাংলাদেশে শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহে অনেকটা শৃঙ্খলা নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে ১৬২২ খ্রিস্টাব্দের দিকে যুবরাজ শাহ্জাহান পিতা ও মাতা নূরজাহানের বিরুদ্ধে বেঁকে দাড়ালেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক মোটামুটি স্বাভাবিক হলেও মাঝে

মাঝে ধর্মান্তরীকরণের ধাক্কা যে হিন্দু সমাজকে বিচলিত করত তাতে সন্দেহ নেই। সমাজের ঈষৎ নীচুতলায় নাথধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। মুসলমান সুফি ও মিয়া সম্প্রদায় বাংলায় বেশ প্রাধান্য পেয়েছিল। মন্তব্য

শিক্ষাদীক্ষার কথা বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে, বৈষ্ণব সমাজ বাদ দিলে সাধারণভাবে হিন্দুসমাজের শিক্ষার বড়ো দুরবস্থা ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিজেদের চেষ্টায় সমাজ, আখড়া ও কেন্দ্রে বৈষ্ণব সাহিত্যাদি অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর হিন্দুসমাজে ক্রমেই শিক্ষার অবস্থা মন্দীভূত হয়ে আসছিল। সামন্তচক্র ভেঙে পড়েছিল, হিন্দু ভূস্বামীরাও সুবাদারের অত্যাচারে ও অবিচারে ক্রমে ক্রমে হীনবল হয়ে পড়েছিলেন।

এই শতাব্দীতে নব্যন্যায় এবং সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। নব্যন্যায়ের কয়েকখানি মূল্যবান টীকা সপ্তদশ শতাব্দীতেই লিখিত হয়েছিল। বৃন্দাবনের সনাতন-রূপ-জীবগোস্বামী রচিত বৈষ্ণব ভাবদ্যোতক রসশাস্ত্র, কাব্য-নাট্যাদি বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। দু-একজন কবি ও পণ্ডিত দু-একখানি সংস্কৃত কাব্যও রচনা করেছিলেন।

৪.২। মনসামঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কয়েকটি মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়, তাদের আগের যুগের কাব্যের মতো গৌরব না থাকলেও এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, সেগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ যুগের সমস্ত মঙ্গলকাব্যই কিছু নিষ্প্রাণ, কিছু গতানুগতিক।

বাইশ কবি মনসামঙ্গল (বাইশা) ঃ-

পূর্ববঙ্গে মনসার পূজা ও ভাসান গানের বিশেষ প্রচার হয়েছিল, নানা মনসামঙ্গল কাব্যের রচনাও এই অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কেউ কেউ একাধিক কবির অংশবিশেষ একত্র গ্রথিত করে মনসামঙ্গলের একপ্রকার সংকলন প্রচার করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে এর দুটি ধারা ছিল, একটির নাম ষট্‌কবি মনসামঙ্গল। এটিতে ছজন কবির মনসামঙ্গল থেকে অংশ-বিশেষ বেছে ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হত। আর একটি ধারার নাম বাইশ-কবি মনসামঙ্গল বা সংক্ষেপে 'বাইশা'। এতে বাইশজন

মন্তব্য

ছোটো-বড়ো কবির রচনাংশ একসঙ্গে গ্রন্থন করা হত। ষট্‌কবির কোনো পুঁথি পাওয়া যায়নি; কিন্তু বাইশার পুঁথি পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কলকাতা থেকে একাধিকবার বাইশ-কবি ছাপা হয়।

এই বাইশ জনের নাম ও রচনাংশ অনেকগুলি ছাপা গ্রন্থে আছে ঃ বিশ্বেশ্বর, অকিঞ্চন দাস, রঘুনাথ দ্বিজ, রমাকান্ত, জগন্নাথ বিপ্র, বংশীদাস দ্বিজ, সীতাপতি, রাধাকৃষ্ণ, বল্লভ ঘোষ, নারায়ণদেব, গোপীচন্দ্র, জানকীনাথ, কমলনয়ন, যদুনাথ, বলরাম, হরিদাস ভট্ট, রামনিধি, অনুপচন্দ্র ভট্ট, রামকান্ত, মহিদাস, দ্বিজ হরিদাস। এঁদের মধ্যে নারায়ণদেব ও বংশীদাসের রচনাই বেশি গৃহীত হয়েছে।

দ্বিজ বংশীদাস ঃ-

ময়মনসিংহের কবি দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। কবির পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির জন্য তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবি বলেই গ্রহণ করতে হয়। তাঁর কন্যা চন্দ্রাবতীও বিদূষী ও কবি-প্রতিভাশালিনী ছিলেন।

বংশীদাসের রচনায় তৎসম শব্দ ও অলঙ্কার বিন্যাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় - কবি যে বেশ পণ্ডিত ছিলেন, এটিই তার প্রমাণ। কবি শক্তি দেবীর বর্ণনা লিখলেও ধর্মমতে বৈষ্ণব ছিলেন বলে মনে করা হয়। কারণ কাব্যের মধ্যে তিনি তাঁর নিজের রচিত চমৎকার বৈষ্ণব পদের উল্লেখ করেছেন।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ-

ছাপাখানার যুগে এ-দেশে মনসামঙ্গলের যে কবি প্রথম মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি হলেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। পশ্চিমবঙ্গের এই কবি মুদ্রণের আগেও পূর্ববঙ্গে বেশ প্রচার লাভ করেছিলেন। ঐ অঞ্চলে তাঁর কাব্য 'ক্ষমানন্দী' নামে একসময় প্রচলিত হয়েছিল। তাঁর অনেক সম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন পুঁথি পাওয়া গেছে। তাকেই অবলম্বন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মনসামঙ্গল প্রকাশিত হয়েছে।

ক্ষেমানন্দ দ্বিতীয় স্তরের কবি। তাঁর কবিপ্রতিভা নিতান্তই সাধারণ স্তরের,

কিন্তু তিনি স্বল্পপ্রতিভা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে অধিকতর খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর কাহিনী-গ্রন্থনেও এমন কিছু বৈচিত্র্য নেই, তবে উষাহরণ পালাটি মন্দ নয়। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীও চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি। মন্তব্য

মানভূম থেকে দেবনাগরী হরফে লেখা ক্ষেমানন্দের ভণিতায় আঞ্চলিক শব্দে পূর্ণ একটি অতিক্ষুদ্র মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গেছে। ভাষা দেখে একে অর্বাচীন বলেই মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গে কেতকাদাস অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করলে তাঁর ভণিতার অনুকরণ প্রান্তীয় অঞ্চলে কেউ এই পুস্তকখানি লিখেছেন মনে করা হয়।

তন্ত্রবিভূতি ঃ-

তন্ত্রবিভূতি মনসামঙ্গলের এক নবাবিষ্কৃত কবি। পূর্বে তাঁর নাম শুনলেও কেউ তাঁর কাব্যের বড় একটা খোঁজ খবর রাখতেন না। ড. আশুতোষ দাস এই কাব্য আবিষ্কার ও প্রচার করার পর এই কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া গেছে। প্রায়-অপরিচিত এই কবির মনসামঙ্গল বিচিত্র ধরনের। মালদহ থেকে এর পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে অধিকাংশ জায়গায় তন্ত্রবিভূতি ভণিতা থাকলেও দু-এক স্থলে জগজ্জীবন ঘোষালের ভণিতাও আছে।

জগজ্জীবন ঘোষাল ঃ-

জগজ্জীবন ঘোষালেও উত্তরবঙ্গের কবি, সম্ভবত তন্ত্রবিভূতির কিছু পরে মনসামঙ্গল রচনা করেন। এঁর কাব্যও প্রকাশিত হয়েছে। কবি কাব্যের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছেন। তা থেকে দেখা যাচ্ছে, দিনাজপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে (পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত) ঘোষাল বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রূপ, মাতার নাম রেবতী। কবির স্ত্রীর নামও (পদ্মামুখী) কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। কাব্যটি রচিত হয়েছিল, পুঁথিতে তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো পুঁথিতে ক্ষেমানন্দের উল্লেখ পাওয়া গেছে। সুতরাং ক্ষেমানন্দের পরেই অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর কাব্য রচিত হয় বলে অনুমান করা যায়।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কোন্ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক মোটামুটি স্বাভাবিক হয়?

উত্তর ঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক মোটামুটি স্বাভাবিক হয়।

২। মনসামঙ্গলের বাইশ জন কবির নাম কী কী?

উত্তর ঃ বিশ্বেশ্বর, অকিঞ্চন দাস, রঘুনাথ দ্বিজ, রমাকান্ত, জগন্নাথ বিপ্র, বংশীদাস দ্বিজ, সীতাপতি, রাধাকৃষ্ণ, বল্লভ ঘোষ, নারায়ণদেব, গোপীচন্দ্র, জানকীনাথ, কমলনয়ন, যদুনাথ, বলরাম, হরিদাস ভট্ট, রামনিধি, অনুপচন্দ্র ভট্ট, রামকান্ত, মহিদাস, দ্বিজ হরিদাস।

৪.৩। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, পুরাণের আনুগত্য আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এর ফলে এই শতাব্দীতে পুরাণের উপর সম্পূর্ণরূপে ভিত্তি করে এবং লৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রায় বর্জন করে দুর্গামঙ্গল নামে একধরনের মঙ্গলকাব্য রচিত হয়, যাকে মঙ্গলকাব্য না বলে পুরাণের অনুবাদ বা অনুকরণ বলা যায়।

চণ্ডীমঙ্গলের এক শক্তিশালী কবি দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গল ড. আশুতোষ দাস আবিষ্কার করেছেন, তাঁরই সম্পাদনায় এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের পুঁথি নোয়াখালি থেকে পাওয়া গেছে, কিন্তু রামদেব চট্টোগ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তাঁর কাব্যে প্রচুর চট্টগ্রামের শব্দ পাওয়া গেছে। তবে কবি বিশেষ কোনো আত্মপরিচয় দেননি।

কবি শাক্ত মঙ্গলকাব্য লিখলেও তাঁর অন্তর ছিল বৈষ্ণব ভক্তিরসে ভরপুর। কাব্যের মধ্যে তিনি কিছু বিষ্ণুপদ সংযোজিত করেছেন, বৈষ্ণব পদাবলী হিসেবেই তা গণনীয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। চণ্ডীমঙ্গলের একজন শক্তিশালী কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ দ্বিজ রামদেব।

৪.৪। দুর্গামঙ্গল কাব্য

মন্তব্য

বাংলাদেশে পুরাণে ও লৌকিক কাহিনীতে সংমিশ্রিত কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী সংকলিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন শিক্ষিত সমাজে পুরাণের প্রভাব প্রসারিত হল, তখন মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতীতে বর্ণিত দেবী চণ্ডীকা কর্তৃক দৈত্যদানব বধের পৌরাণিক কাহিনীও কিছু কিছু প্রচার লাভ করেছিল।

দ্বিজ কমললোচন রংপুরের লোক। কাব্যের মধ্যে তিনি শাহ্সুজার নাম উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চণ্ডিকাবিজয় কাব্যটি রচিত হয়। কাব্যটি ১৪৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতী তাঁর প্রধান অবলম্বন। সুরথ রাজা, মেধম্ মুনি ও সমাধি বৈশ্যের প্রসঙ্গ নিয়ে কাব্য আরম্ভ হয়েছে, তারপর ক্রমে ক্রমে দেবী চণ্ডিকা দ্বারা শুম্ভ-নিশুম্ভাদি অসুর-দলন বর্ণিত হয়েছে। কবি বহু জায়গাতেই মার্কণ্ডেয় পুরাণকে অনুবাদ করেছেন।

কবি ভবানীপ্রসাদ রায় 'দুর্গামঙ্গল' শীর্ষক যে চণ্ডীমহিমা-বিষয়ক কাব্য রচনা করেন, তাও অনেকটা আগের কাব্যের মতোই মার্কণ্ডের চণ্ডীর অনুসরণ। ময়মনসিংহের কবি রূপনারায়ণ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কিছু অংশ অবলম্বন করে দুর্গামঙ্গল রচনা করেছিলেন। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কাব্য রচিত হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। দুর্গামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন এমন কয়েকজন কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ দ্বিজ কমললোচন, ভবানীপ্রসাদ এবং রূপনারায়ণ।

৪.৫। শিবায়ন কাব্য

ভারতীয় সভ্যতায় শিব এক বিস্ময়কর রূপে অধিষ্ঠিত। ইনি ত্রিমূর্তির অর্থাৎ Hindu Trinity-র অন্যতম। প্রলয়কালে রুদ্রমূর্তিতে ইনি বিশ্ব সংহার করেন তাই তিনি 'হর', অনবচ্ছিন্ন কালে তিনি পরিব্যাপ্ত তাই তিনি 'মহাকাল', ইনি বিরূপনেত্র তাই 'বিরূপাক্ষ', তাঁর তিনটি চক্ষু তাই তিনি 'ত্রিনয়ন', মৃত্যুকে জয় করেছেন তাই 'মৃত্যুঞ্জয়', অগ্নিনেত্রে

মন্তব্য

কাম বা স্মর জয় করেছেন বলে তিনি 'স্মরহর', পিনাক বা শূল তাঁর অস্ত্র বলে তিনি 'পিনাকী' - ইত্যাদি অগণিত নামে শিব বিরাজিত। আর্যভাবনায় তিনি রুদ্র দেবতা, তিনি যোগীশ্বর, তিনি শান্ত, তিনি কল্যাণময়, তিনি সর্বত্যাগী সাধক; আবার অনার্য কল্পনায় তিনি ভয়াল ভয়ংকর, তিনি ধ্বংসের দেবতা; লোকায়ত ব্রাত্য সমাজে শবর-পুলিন্দ, ব্যাধ নিষাদ জনগোষ্ঠীতে তাঁর অবস্থান।

মধ্যযুগে বাংলায় শিবকে অবলম্বন করে কয়েকটি মঙ্গলকাব্যজাতীয় ও সমরীতির রচনা আছে - শিবায়ন, শিব সংকীর্তণ, মৃগলুব্ধ, শিবপুরাণ ইত্যাদি। সাধারণভাবে এদের শিবায়ন নামেই অভিহিত করা হয়। শিবায়ন-এর মধ্যে পুরাণকথা ও লোককথার সমন্বয় ঘটেছে। শিবায়ন-এর লেখকদের মধ্যে আছেন শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ রায়, রামরাজা, রতিদেব এঠবং রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)।

রামকৃষ্ণ রায় ছিলেন 'শিবায়ন' কাব্যের বিশিষ্ট কবি। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর কাব্যের নাম 'শিবমঙ্গল' ছাব্বিশটি পালায় বিন্যস্ত। কাশীখণ্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি থেকে তিনি উপাদান নিয়েছেন। পৌরাণিক কথাই তাঁর কাব্যে সম্যক প্রধান্য পেয়েছে। তাঁর জ্ঞান পাণ্ডিত্য কবিত্বশক্তি এক্ষেত্রে প্রবল যে জন্য তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

শঙ্কর কবিচন্দ্র শিবায়নের কবি হলেও তাঁর কাব্যের পুঁথি পাওয়া যায়নি। তবে অনেকের মতে একাধিক শঙ্কর কবিচন্দ্র ছিলেন যাঁর রচনার সঙ্গে শিবায়ন রচয়িতার নাম মিশে যাওয়া অসম্ভব নয়। শঙ্কর সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে শিবায়ন রচনা করেন, যদিও তাঁর কিছু গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রচিত হতে পারে। তাঁর 'শঙ্খপরা' ও 'মাছধরা' দুটি পালা পাওয়া গেছে যে দুটি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়েছিল।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন কবি। তাঁকে 'শিবসংকীর্তন' বা 'শিবায়ন' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে অভিহিত করা যায়। রামেশ্বর চারটি কাব্য রচনা করেন - 'সত্যপীরের ব্রতকথা', 'শীতলামঙ্গল' বা 'মগপূজাপালা', 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' এবং 'শিব সংকীর্তন' বা 'শিবায়ন'। 'শিবায়ন'-এর রচনাকাল ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

মন্তব্য

১। রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ন' কাব্যের নাম কী?

উত্তর ঃ 'শিবমঙ্গল'।

২। শঙ্কর কবিচন্দ্রের শিভায়নের যে দুটি পালা লোকপ্রিয় হয়েছিল সেগুলির নাম কী?

উত্তর ঃ 'শঙ্খপরা' এবং 'মাছ ধরা'।

৩। রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত চারটি কাব্য কী কী?

উত্তর ঃ 'সত্যপীরের ব্রতকথা', 'শীতলামঙ্গল' বা 'মগপূজাপালা', 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' এবং 'শিব সংকীর্তন'।

৪.৬। ধর্মমঙ্গল কাব্য

মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী, ষষ্ঠী, শীতলা, অন্নদা, শিব বা দুর্গা এবং ধর্ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের বেশিরভাগ দেবতাই মর্ত্যধামে নিজ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বর্গের বিভিন্ন চরিত্রগুলির বিশেষ কোনো একটি বা দুটিকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে প্রেরণ করেছেন এবং মর্ত্যলোকে নিজ পূজা প্রচার করে তাকে বা তাদের আবার স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মদেবতার পূজা প্রচলন ও অন্যান্য রীতিনীতির ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন মঙ্গলকাব্যের সর্বকনিষ্ঠ দেবতা হলেন ধর্মঠাকুর। মঙ্গলকাব্যে তিনি হলেন একমাত্র পুরুষদেবতা। শক্তিতন্ত্র বা শক্তিসাধনা থেকে বিশিষ্ট হওয়াতেই সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কোনো ভয় বা ভীতি প্রদর্শন নয়, রাঢ় অঞ্চলের মানুষজন নিজেদের অবহেলিত, লাঞ্ছিত জীবনযাত্রা থেকে মুক্তি পেতে ধর্মদেবতার শরণাপন্ন হন এবং ভক্তিপূর্ণমনে দেবতার পূজা করেন।

ময়ূরভট্ট ঃ-

অনেকের মতে ময়ূরভট্ট হলেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি। পরবর্তী কবিরা

মন্তব্য

কেউ কেউ ময়ূরভট্টের কাব্যের উল্লেখ করেছেন ও তাঁকে বন্দনা করেছেন। কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বলেছেন -

ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।

ঘনরাম আরো বলেছেন-

হাকন্দপুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে

জ্ঞানগম্য শ্রীধর্মসভায়।

ময়ূরভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দপুরাণ'। মাণিক গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি তাঁদের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যরচনা প্রসঙ্গে ময়ূরভট্টের কথা বলেছেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ-

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। তাঁর চারপুত্র রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামকৃষ্ণ - এই নামকরণের মধ্যে দিয়েই তাঁর রাম অবতারের প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠাভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

রূপরাম চক্রবর্তী ঃ-

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য হল ধর্মমঙ্গল কাব্য। সম্ভবত ধর্মঠাকুর মঙ্গলকাব্যের সর্বকনিষ্ঠ দেবতা। এই ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে কমবেশি কুড়ি জন কবি তাঁদের মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলেন রাঢ় অঞ্চলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মদেবতাকে কোথাও কোথাও অনাদ্য, অনাদি ও নিরঞ্জন বলা হয়েছে। এখান থেকেই হয়ত কবি 'অনাদ্যমঙ্গল' নামটি গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কয়েকজন কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ ময়ূরভট্ট, ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী।

২। ঘনরাম চক্রবর্তীর চারজন পুত্রের নাম কী?

উত্তর ঃ রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামকৃষ্ণ।

মন্তব্য

৪.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। মনসামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে কী জানো?

৩। দুর্গামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। শিবায়ন কাব্য সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

৫। ধর্মমঙ্গল কাব্য বলতে কী বোঝ?

৪.৮। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার রায়।

২। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি - সুকুমার সেন।

৩। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। বাঙালির ইতিহাস - নীহাররঞ্জন রায়।

একক-৫ নাথ সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য

বিন্যাসক্রম

৫.১। নাথ সাহিত্যের ভূমিকা

৫.২। গোরক্ষনাথ বৃত্ত

৫.৩। ময়নামতী বা গোপীচন্দ্র বৃত্ত

৫.৪। অনুবাদ সাহিত্য-রামায়ণ

৫.৫। মহাভারত

৫.৬। ভাগবত ও বৈষ্ণব কাব্য

৫.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

৫..৮। সহায়ক গ্রন্থ

৫.১। নাথ সাহিত্যের ভূমিকা

নাথ সাহিত্য চর্যাপদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঃ দুটি ধারাতেই সিদ্ধাচার্যদের কতকগুলি সাধারণ নাম পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয়, দুটিতে যে সাধনাক্রম বর্ণিত হয়েছে তা একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। চর্যাপদে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণনা আমরা পাই তা উন্নত এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, সেরকম প্রাচীন পুরাণ ও উপনিষদে উল্লিখিত যোগসাধনার বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রতিরূপ অনেকটা সেরকম। এর মূল বক্তব্য হল চিন্তাবৃত্তির উন্মীলনের দ্বারা সমস্ত জাগতিক পার্থক্যের লোপ ও মনের শূন্যতা বিধান - পরম সত্যচেতনার মধ্যে তার বিলয়। নাথ সাহিত্যে এই তত্ত্বকে প্রাকৃত উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের আদিম বিস্ময়বোধ ও অন্ধ আজও বিপ্রীতির পর্যায়ে নামানো হয়েছে। রংপুর- কুচবিহার অঞ্চলের আদিবাসীদের মুখে মুখে এর আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল। এর ফলে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন কবি-রচিত সাহিত্যিক রূপ এবং লোকমুখে গীত, সাহিত্যপরিমার্জনাহীন, লৌকিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত রূপ- কাহিনীর এই দুটি রূপ পাশাপাশি প্রচলিত ছিল।

মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথঃ, জালন্ধরি পাদ (হাড়ি পা), গোরক্ষনাথ (গোরখনাথ), কানু পা (কাহ্ন পা) - এঁরা কে, কোথায় জন্মেছিলেন এবং এঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কিরকম ছিল তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। একদিকে এঁদের সম্প্রদায়ের ধারা বহন করেছে কান-ফাটা যোগীরা ও নানা অবধূত সম্প্রদায় তাদের বেশভূষায়, সাধনায়; আবার অন্যদিকে এঁদের স্মৃতি ও কাহিনী জাগিয়ে রেখেছে বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের যোগীজাতি।

এই কাহিনীর দুইটি প্রধান শাখা রয়েছে - মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় এবং ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান। যোগীদের পরম গুহ্য সাধনা হল- 'বিন্দু-ধারণ', ঊর্ধরেতা হয়ে ষট্‌চক্রভেদ করা ইত্যাদি। প্রথম শাখা অর্থাৎ 'মীনচেতন' বা 'গোরক্ষবিজয়ে'র বিষয় হল সিদ্ধাচার্য মীননাথের কদলীপত্তনের নারীদের মোহে পড়ে তত্ত্বজ্ঞান-বিস্মৃতি ও শেষ পর্যন্ত শিষ্য গোরক্ষনাথের চেষ্টায় তার উদ্ধারসাধন। অন্যদিকে দ্বিতীয় কাহিনীতে অর্থাৎ 'ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের গান' কাহিনীতে পাওয়া যায় গোরক্ষনাথ-শিষ্য ও তত্ত্বজ্ঞা ময়নামতীর নির্দেশে তাঁর একমাত্র পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সংসারত্যাগ ও দীক্ষা গ্রহণ। প্রথম আখ্যানটিতে শুধুমাত্র দুরুহ সাধনতত্ত্বের রূপক-ব্যাখ্যা আছে বলে তা জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্বিতীয় আখ্যানটিতে তরুণী রাজমহিষীদ্বয় অদুনা-পদুনার স্বামীবিচ্ছেদবেদনার মর্মান্তিক খেদের বর্ণনা থাকার জন্য তা জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। প্রথম আখ্যানের কবি বা রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ হলেন শ্যামাদাস সেন, ভীমসেন রায়, শেখ ফয়জুল্লা ও কবীন্দ্র দাস। নাথসাহিত্যের বিভিন্ন গাথার মধ্যে সাদৃশ্য এত বাহুল্য পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় যে, মনে হয় এর রচয়িতারা একই আদর্শ অনুসরণ করেছেন এবং মাঝে মাঝে রচনার অভিন্নতার মধ্যে বর্ণনার একটু আধটু পরিবর্তন করেছেন। এই সকল লেখকদের মধ্যে কে আদি কবি আর কে নকলকারক তার যথার্থ অবধারণ করা সত্যই অসম্ভব। দ্বিতীয় আখ্যানের লেখকদের মধ্যে যাঁদের পুথি পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস ও আবদুল সুকুর মহম্মদ।

এই নাথসাহিত্যের মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে যোগযোগ রাখার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছি; কিন্তু পৌরাণিক দেবদেবী শিব-দুর্গা প্রমুখের যে চিত্র পাওয়া গেছে

মন্তব্য

তা লৌকিক কল্পনার দ্বারা বিকৃত ও হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে। যমের সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর যে শক্তিপরীক্ষার বোঝাপড়া হয়েছে তাতে প্রাকৃত রুচিসম্মত উদ্ভট ঘটনার সন্নিবেশ, পরস্পরকে ঠকাবার জন্যে নানারকম আজগুবি কৌশল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এদের পারলৌকিক পরিকল্পনার মধ্যেও ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদা বোধের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সিদ্ধাদের মধ্যে অনেককেই হীনবৃত্তিধারী ও স্বীয় অলৌকিক শক্তিপ্রকটনে অতিব্যগ্র রূপে দেখানো হয়েছে। এমন কি ময়নামতী, গোবিন্দচন্দ্র ও রানী অদুনা-পদুনার মধ্যেও অভিজাতসুলভ আচার-আচরণের নিদর্শন নেই- সকলেই যেন ছেলেমানুষের মতো অস্থির, খামখেয়ালী ও নিরঙ্কুশ কল্পনার মূর্ত বিকাশ। এই সমস্ত বিষয় থেকে এই ধারণাই জন্মায় যে, সমস্ত আখ্যানটি আদিম দেবকল্পনার একটা অর্ধবিকশিত রূপ এবং আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। এর সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যোগীদের কথার ও গল্পের একটা সম্পর্ক আছে। মুসলমান ফকির-দরবেশের কেরামতির গল্পেও তা পুষ্ট হয়েছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিশেষ করে ধর্ম-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে এইসব অলৌকিক কাহিনীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধ যোগীদের কাহিনী লিখিত আকারে বাংলা সাহিত্যে অনেক পরে প্রবেশ করেছে।

'গোরক্ষ-বিজয়'-এর পুথি পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকে- সহদেব চক্রবর্তীর ও রামাই পণ্ডিতেব 'ধর্মপুরাণে' বা 'অনিল পুরাণে'।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। নাথসাহিত্য কার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

উত্তর ঃ নাথসাহিত্য চর্যাপদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

২। নাথসাহিত্যের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ নাথসাহিত্যের মূল বক্তব্য হল চিত্তবৃত্তির উন্মীলনের দ্বারা সমস্ত জাগতিক পার্থক্যের লোপ ও মনের শূন্যতা বিধান - পরম সত্যচেতনার মধ্যে তার বিলয়।

৩। নাথসাহিত্যের প্রধান দুটি শাখা কী কী?

মন্তব্য

উত্তর ঃ নাথসাহিত্যের প্রধান দুটি শাখা হল - মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় এবং ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান।

৪। যোগীদের পরম গুহ্য সাধনা কী?

উত্তর ঃ যোগীদের পরম গুহ্য সাধনা হল - 'বিন্দু-ধারণ'।

৫। দ্বিতীয় আখ্যানের উল্লেখযোগ্য লেখক কারা?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় আখ্যানের উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস ও আবদুল সুকুর মহম্মদ।

৬। 'গোরক্ষ-বিজয়'-এর পুথি কবে, কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ 'গোরক্ষ-বিজয়'-এর পুথি পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকে- সহদেব চক্রবর্তীর ও রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুরাণে' বা 'অনিল পুরাণে'।

৫.২। গোরক্ষনাথ বৃত্ত

মঙ্গলকাব্যের মতো সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়েই 'গোরক্ষ-বিজয়' কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় পুঁথিতে দেখা যায় গুরু মীননাথ কদলীপত্তনে গিয়ে সেখানকার নারীদের সৌন্দর্য মোহিত হয়ে সাধনামার্গ থেকে বিচ্যুত হলেন এবং সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়মুখপ্রধান জীবন যাপন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুর অধঃপতনের কাহিনী জানতে পেরে নর্তকীর ছন্দবেশে কদলী নগরে প্রবেশ করলেন এবং বাদ্য ও নৃত্যের মাধ্যমে গুরুকে তাঁর বিস্মৃত মহাজ্ঞানের তত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দিলেন। এই আখ্যানের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল নানারূপ হেঁয়ালি, ছড়া ও রূপক-প্রয়োগের সাহায্যে পরমতত্ত্ব-প্রতিপাদন। এই গভীরার্থক হেঁয়ালি-রচনার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ-

''পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে। (ডুবে)

বামাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।।

নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল।

মন্তব্য

আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল।।

ঝিম যাউক বরিষা শীতলে যাউক মীন।

ঝাঁপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন।।

এই ধরনের হেঁয়ালিপূর্ণ ভষায় বাংলা দেশের ছোটো ছোটো অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের তত্ত্বরহস্য আবৃত ও উদঘাটিত হয়েছে। সহজিয়া, বাউল ও তন্ত্রসাধনাতেও এই বিপরীত ভাবের রহস্যময় সমাবেশ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

'গোরক্ষবিজয়'-এর আদি রচয়িতা হলেন শেখ ফয়জুল্লা। এঁর কালনির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নাথ-সাহিত্য' (বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্যপ্রকাশিকা', প্রথম খণ্ড) প্রবন্ধে ডাঃ এনামূল হক কর্তৃক আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির বিক্ষিপ্ত পাতায় প্রাপ্ত 'সেখ ফয়জুল্লা'র 'স্যতপীরের পাঁচালী'- রচনার কালনির্দেশক সঙ্কেতের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা শেষার্ধে স্থাপন করেছেন। এই পত্রে শুধু 'সত্যপীরের পাঁচালী'র রচনাকালই সঙ্কলিত হয়নি; কবির পূর্বরচিত দুটি কাব্যও- গোরবিজয় ও গাজীবিজয়ও সঙ্কলিত হয়েছিল।ত এই কাহিনীর প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি রচিত 'গোরক্ষবিজয়'-এর একটি খণ্ডিত পুঁথির আবিষ্কার থেকে। নাটকটি সংস্কৃতে লেখা এবং এর গানগুলি মৈথিলী ভাষায় রচিত।

'গোরক্ষবিজয়'-এর মূল অভিপ্রায় হল নাথধর্মের কায়াসাধনের তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়মুখবিভ্রান্ত মীননাথের চৈতন্য-সম্পাদন ও সাধনা সংকল্প উদ্দীপন। সুতরাং বলা যেতে পারে, তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাই এই কাব্যে প্রদান স্থান অধিকার করেছে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে তত্ত্বালোচনার মধ্যে যে সংহত অর্থগূঢ়তা, অচ্ছেদ্য যুক্তিশৃঙ্খলা ও দৃষ্টান্ত-সহযোগে জীবনরসের প্রয়োগদক্ষতার পরিচয় পাওযা যায় তা উচ্চাঙ্গের মনন ও কাব্যকৌশলের নিদর্শন।

এই রচনার ক্ষেত্রে গোরক্ষনাথের যেমন অসীম ধৈর্য, অটল অধ্যবসায় ও অবস্থানুযায়ী বিভিন্নরূপ উপায়- দক্ষতা দেখা যায়; মীননাথেরও তেমন উৎসাহ-অবসাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মুহুর্মুহু সংকল্প শিথিলতা ও আত্ম-অবিশ্বাসের ওঠা-নামা

সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। আমরা গোরক্ষনাথ ও মীননাথকে দুই বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতীকরূপে দেখি না; তারা তাদের জীবনের সবটুকু শক্তি-দুর্বলতা, নিষ্ঠা-নীতিশৈথিল্য, অধ্যাত্ম-সংগ্রামরত দুই মানবাত্মার সমস্ত উত্তেজনা ও অবসাদ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। মন্তব্য

নাথসাহিত্যে আমরা ভোগাসক্ত পদস্খলিত প্রৌঢ় ইন্দ্রিয়াকর্ষণের বিদায়বেদনাটুকু উত্তুঙ্গ সাধনমহিমার দুর্গপ্রাকারের ফাঁক দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। এই ধর্মাধিকৃত প্রেম কবির সহানুভূতি থেকে একেবারেহ বঞ্চিত হয়নি। তাই কদলীরানী মঙ্গলা ও গোরক্ষনাথের রূপমুগ্ধা কদলীবাসিনী নারী তাদের ব্যর্থ আকুতি ও উচ্ছিন্ন জীবনের করুণা দিয়ে আমাদেরকে কাব্যের আদর্শ বিরোধী সহানুভূতিতে কিছুটা বিচলিত করে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কী দিয়ে 'গোরক্ষবিজয়' কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে?

উত্তর ঃ মঙ্গলকাব্যের মতো সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়েই 'গোরক্ষবিজয়' কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে।

২। এই আখ্যানের প্রধান উপজীব্য বিষয় কোন্‌টি?

উত্তর ঃ এই আখ্যানের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল নানারকম হেঁয়ালি-ছড়া ও রূপক-প্রয়োগের সাহায্যে পরমতত্ত্ব-প্রতিপাদক।

৩। 'গোরক্ষবিজয়'-এর আদি রচয়িতা কে?

উত্তর ঃ 'গোরক্ষবিজয়'-এর আদি রচয়িতা হলেন ফয়জুল্লা।

৪। 'গোরক্ষবিজয়'-এর মূল অভিপ্রায় কী?

উত্তর ঃ 'গোরক্ষবিজয়'-এর মূল অভিপ্রায় হল নাথধর্মের কায়াসাধনের তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়মুখবিভ্রান্ত মীননাথের চৈতন্য-সম্পাদন ও সাধনা-সংকল্প-উদ্দীপন।

৫.৩। ময়নামতী বা গোপীচন্দ্র বৃত্ত

নাথধর্মের দ্বিতীয় গ্রন্থ-ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই কাহিনী বাংলাদেশকে অতিক্রম করে সর্বভারতীয় স্তরে প্রসার লাভ করেছে।

মন্তব্য

নেপালে প্রাপ্ত একটি নাট্যপালার - 'গোপীচন্দ্র নাটক' (সপ্তদশ শতক) - এটির বিষয়ে ড. সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। অতএব মনে করা হয় যে, গোপীচন্দ্র বিষয়ক রচনা, বাংলাদেশের বাইরেই আরম্ভ হয় এবং তার প্রাচীনতর নিদর্শনগুলি বাংলাদেশের বাইরের ভূভাগের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। বাংলা দেশের কবিগোষ্ঠী সাধারণত আধুনিক কালেই তাঁদের নিজের ঘরের কথার কাব্যসম্ভাবনা আবিষ্কার করেছেন।

'গোপীচন্দ্র' আখ্যানের সুদীর্ঘ ছড়াটি অশিক্ষিত নাথ-যোগীদের মধ্যে মৌখিক আবৃত্তির সাহায্যে স্মৃতিবিধৃত হয়ে এসেছে। এটি খাঁটি লোকসাহিত্যের মতো যৌথ রচনার বাগ্‌ভঙ্গী, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, অতিপল্লবি বর্ণনাবাহুল্য ও ঘটনাবিস্তার প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত। প্রাকৃত জনসাধারণের উদ্ভট দেবকল্পনা ও পারলৌকিক সংস্কার এর মধ্যে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করেছে।

গোপীচন্দ্রের বিষয় অবলম্বন করে তিনজন কবির রচনা পাওয়া গেছে। সেগুলি হল- দুর্লভ মল্লিক রচিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', ভবানী দাস-রচিত 'অপূর্ব কথন' এবং সুকুর মহম্মদ রচিত 'যোগান্ত পুঁথি' বা 'যোগীর পুঁথি' - এগুলি আধুনিক কালে বিভিন্ন পণ্ডিত কবিদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মূল বিষয় অভিন্ন হলেও আখ্যান-বিবৃতি ও ঘটনা-সমাপ্তির মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে তত্ত্ব অপেক্ষা মানবিক আবেগেরই প্রাধান্য দেখা যায়। ময়নামতী তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলেকে কায়সাধনার রহস্য শোনাচ্ছেন এবং হাড়ির ছদ্মবেশে অবস্থিত সিদ্ধযোগী হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদের কাছে দীক্ষাগ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন। পুত্র নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে এই হীনবর্ণের গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণে সম্মত হল, কিন্তু গুরুর প্রতি তার প্রকৃত ভক্তি বোধ হয় কোনো দিনই জন্মায় নি। এই বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে যে সমাজ-চিত্র ফুটে উঠেছে তা রুচিবোধ, সংস্কৃতির মান ও ধর্মচেতনার বিচারে কোনা সমুন্নত উৎকর্ষের দাবি করতে পারে না। গুরুকে মাটির তলায় পুঁতে রাখার মধ্যে গুরু-শিষ্যের সহজ সম্বন্ধটি তার সমস্ত মাধুর্য হারিয়েছে। গোবিন্দচন্দ্রের যোগসাধনা যে সার্থকতা লাভ করেছে, সে যে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তার সংসার-জীবনে

ব্যগ্র প্রত্যাবর্তনে ও রানীদের তরলপ্রমোদপূর্ণ মঙ্গলিপ্সায় তার কোনো প্রমাণ মেলে না। অশিক্ষিত, আদিমসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ থেকেও যে এরকম উন্নত, যথাযথ ভাবপ্রকাশক্ষম, সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিস্ফুট করতে নিপুণ, কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনার প্রেরণা এসেছে তাই বাঙালী-জীবনের এক চিরন্তন বিস্ময়। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। নাথসাহিত্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ কোন্‌টি?

উত্তর ঃ নাথসাহিত্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।

২। 'গোপীচন্দ্র নাটক' কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?

উত্তর ঃ 'গোপীচন্দ্র নাটক' সপ্তদশ শতকে নেপালে পাওয়া গিয়েছিল।

৩। গোপীচন্দ্রের বিষয় অবলম্বন করে যে তিনজন কবির রচনা পাওয়া যায় সেগুলি কী কী?

উত্তর ঃ দুর্লভ মল্লিক রচিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'; ভবানী দাস রচিত 'অপূর্ব কথন' এবং সুকুমার মহম্মদ রচিত 'যোগান্ত পুঁথি' বা 'যোগীর পুঁথি'।

৪। ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে তত্ত্ব অপেক্ষা কার প্রাধান্য বেশি?

উত্তর ঃ ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে তত্ত্ব অপেক্ষা মানবিক আবেগেরই প্রাধান্য বেশি।

৫.৪। অনুবাদ সাহিত্য-রামায়ণ

হোমার যদি গ্রীক-সংস্কৃতির প্রতিভূ হন, তা হলে রামায়ণের বাল্মিকীকেও বলা যেতে পারে সমগ্র ভারত-চেতনার স্থানকালাতীত প্রতীক। এই প্রসঙ্গে ড. সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে-

"The Ramayana is a work of the same or similar rank with the Rig-veda and the Mahabharata as well as the Sikh Guru-Granth (also of India), with the Iliad

and the Odyssey and other Homeric corpus of ancient Greece (along with the works of Heriod and the three great tragic poets), with the Old Testament of the Jews, with the Shah-Wamah of Iran, and with the Arabian Nights of Muslim Arabia."

এই রামায়ণ মহাকাব্য শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরেও বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেমন - ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, কোচিন, চায়না, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি, ইন্দো-চায়না, ইন্দোনেশিয়া, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চিন, কোরিয়া, জাপান। ভারতবর্ষের বাইরে, আধুনিক ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কার ভাষাতেও বাল্মিকী রামায়ণ অবলম্বনে একাধিক রামকথা রচিত হয়েছে। এই সকল বিভিন্ন রামায়ণ নিয়ে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কখনো কোনোটির কিছু উন্মোচন হয়েছে, কখনো-বা অধিকতর জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

অদ্ভুত আচার্য ঃ- ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর আগে বিশেষ কেউ অদ্ভূত আচার্যের রামায়ণ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেননি। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বুকানন নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারী উত্তরবঙ্গে অবস্থান করেন এবং তিনি বলেন যে, উত্তরবঙ্গে অদ্ভূত আচার্য নামে এক কবির রামায়ণের বিশেষ প্রচার আছে। মালদহ থেকে কবির পুঁথি পাওয়া গেছে। এরপর ১৯১৩ সালে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় অদ্ভূত আচার্যের রামায়ণের আদিকাণ্ড প্রকাশিত হয়। কবির অধিকাংশ পুথি পাওয়া গেছে মালদহ ও রংপুর থেকে। কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ ঘোষ।

রজনীকান্তের সম্পাদনায় অদ্ভূত আচার্যের কিছুটা প্রকাশিত হবার পর এবিষয়ে নতুন করে তথ্য উত্থাপন করেন ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ড. ভট্টশালী সমসাময়িক কুলজীগ্রন্থ এবং স্থানীয় জমিদার বংশের ইতিহাস থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, অদ্ভূত আচার্য (নিত্যানন্দ) ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

কবি অদ্ভূত আচার্য উত্তর-বাংলায় যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁর জনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ হলো, কৃত্তিবাসি রামায়ণেও

তাঁর কিছু কিছু রচনা চলে গেছে। কবির রামায়ণ অদ্ভূত রামায়ণ বলে পরিচিত হলেও মূল সংস্কৃত অদ্ভূত রামায়ণের সঙ্গে তাঁর কাব্যের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। কবির পরিচ্ছন্ন রচনারীতি সুখপাঠ্য, করুণরস ও গভীর আবেগের স্থলেও তাঁর লেখনী সজল ও সরস। বর্ণনার রীতিতে তিনি মোটামুটি কৃত্তিবাসের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। অবশ্য তাঁর প্রতিভা কৃত্তিবাসের চেয়ে নিকৃষ্ট মানের। কৃত্তিবাস মূল বাল্মীকির ধারাকে কোনো কোনো জায়গায় হুবহু অনুসরণ না করলেও তাঁর সামঞ্জস্যবোধ প্রায় অধিকাংশ জায়গাতেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অদ্ভূত আচার্য এমন সমস্ত উদ্ভট ও আজগুবি আখ্যান সংযোজন করেছেন যে, তার প্রতিবার সংযম ও কল্পনার সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করে বিষন্ন হতে হয়। তাঁর পুরো পুঁথি পাওয়া যায়নি কেন, সে প্রশ্নের যুক্তিসংগত জবাব দেওযা যায় না। তাঁর খণ্ডিত পুঁথির সংখ্যাও নগণ্য মাত্র। অদ্ভূত আচার্য কৃত্তিবাসের সমকক্ষ না হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর রামায়ণ-সাহিত্যের কিছু প্রতিবার পরিচয় দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রামায়ণ মহাকাব্য কোথায় কোথায় প্রভাব বিস্তার করেছিল?

উত্তর ঃ ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, কোচিন, চায়না, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি, ইন্দো-চায়না, ইন্দোনেশিয়া, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চিন, কোরিয়া, জাপান।

২। অদ্ভূত আচার্যের রামায়ণ নিয়ে কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন?

উত্তর ঃ ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী অদ্ভূত আচার্যের রামায়ণ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

৩। কবির প্রকৃত নাম কী?

উত্তর ঃ কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ ঘোষ।

৪। অদ্ভুত আচার্য কোন্ ধারাকে অনুসরণ করেছেন?

উত্তর ঃ অদ্ভুত আচার্য মোটামুটি কৃত্তিবাসের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন।

মন্তব্য

রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদক

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরো কিছু রামায়ণ রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। অখণ্ডিত ও খণ্ডিত পুঁথির হিসাব দেখলে আরো আটজন কবির পুঁথি পাওয়া যাবে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেন, কেউ কেউ সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের কোনো কোনো কাহিনী অবলম্বনে রামায়ণ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, ঘনশ্যামদাস, ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, কৈলাস বসু, চন্দ্রাবতী প্রমুখ কয়েকজন কবি রামায়ণের নানা আখ্যন অবলম্বন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবার পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মহিলাকবি চন্দ্রাবতী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বেশ কবিপ্রতিভা ছিল। মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের বিদূষী কন্যা চন্দ্রাবতী চিরকৌমার্য অবলম্বন করেছিলেন। লোককথা অবলম্বন করে তিনি ছড়া-পাঁচালীর ঢঙে রামকথা রচনা করেছিলেন। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সর্বত্র খাঁটি ও প্রাচীন রচনা নয়। কবির যখন কোনো প্রামাণিক পুঁথি পাওয়া যায় নি, তখন চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে নিঃসন্দেহে প্রামাণিক ও প্রাচীন বলে মেনে নেওযা যায় না।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কয়েকজন রামায়ণ কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, ঘনশ্যামদাস, ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, কৈলাস বসু প্রমুখ।

২। একজন মহিলা রামায়ণরচনাকারের নাম লেখো।

উত্তর ঃ একজন মহিলা রামায়ণরচনাকার হলেন চন্দ্রাবতী।

৩। চন্দ্রাবতী কেমন রামকথা রচনা করেছিলেন?

উত্তর ঃ চন্দ্রাবতী লোককথা অবলম্বন করে ছড়া-পাঁচালীর ঢঙে রামকথা রচনা করেছিলেন।

৫.৫। মহাভারত

মন্তব্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কাশীরামদাসের মহাভারত বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা ও অদ্ভুত গৌরব লাভ করেছে। দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খাঁ, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যামদাস ও নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত সংহিতাকে কোথাও পুরোপুরি, আবার কোথাও অংশত অনুসরণ করেছিলেন।

নিত্যানন্দ ঘোষ

নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারতের অনুবাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'গৌরীমঙ্গল'-এর একটি পুঁথিতে পাওযা যায়, কাশীরাম দাসের পূর্বে নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিত্যানন্দের একটি পুঁথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় সংগৃহীত আছে। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য কাশীরামের পুঁথির কোনো কোনো রচনা চলে গেছে। নিত্যানন্দের রচনা কোনো বিশেষ কাব্যগুণে অধিকারী না হলেও বাহুল্যবর্জিত সহজ স্বাভাবিক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করা যায়। নিত্যানন্দের কাব্য মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করেনি বলে তাঁর প্রতিভা পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়নি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। মহাভারতের একজন অনুবাদকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ মহাভারতের একজন অনুবাদক হলেন নিত্যানন্দ ঘোষ।

২। নিত্যানন্দ ঘোষ যে মহাভারত রচনা করেছিলেন তা কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ 'গৌরীমঙ্গল'-এর একটি পুঁথিতে পাওযা যায়।

৩। কয়েকজন মহাভারতের অনুবাদকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ কয়েকজন মহাভারতের অনুবাদক হলেন - দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খাঁ, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যামদাস ও নিত্যানন্দ ঘোষ।

মন্তব্য

কাশীরাম দাস

কাশীরাম দাসের পৈতৃক উপাধি ছিল 'দেব'। কবি মহাভারতের দু-একটি জায়গায় নিজের সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি করেছেন। কাশীরাম সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

মধ্যযুগের সব অনুবাদকের মতো কাশীরাম মহাভারতের মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ করেছেন বলা যায়। তাঁর বর্ণনা বেশ সরস ও গতিযুক্ত হলেও উত্তর-চৈতন্যযুগের প্রভাবে ভাষার মধ্যে বড়ো বেশি তৎসম শব্দ, সমাস-সন্ধির কিছু বাড়াবাড়ি এবং আলংকারিক অতিরেক দেখা যায়। সে যুগের অনেক স্বল্পপ্রতিভাধর কবি কোনো বড়ো কবির ভণিতায় কাব্যরচনা করে নিজেদের অক্ষম রচনাকে কালের দরবারে পাংক্তেয় করতে চেষ্টা করতেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কাশীরাম দাসের পৈতৃক উপাধি কী ছিল?

উত্তর ঃ কাশীরাম দাসের পৈতৃক উপাধি ছিল 'দেব'।

৫.৬। ভাগবত ও বৈষ্ণব কাব্য

ভাগবত বৈষ্ণব-সমাজের উপনিষদ বলে বিবেচিত হলেও এর শুধু বৃন্দাবনলীলাটুকু বৈষ্ণব-সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ভাগবত অবলম্বনে সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন ভক্তকবি কৃষ্ণলীলা-কাহিনী রচনা করেছিলেন। কাশীরামের অগ্রজ কৃষ্ণদাস, দ্বিজ হরিদাস, অভিরাম দত্ত, দুর্লভ নন্দন, কবিচন্দ্র প্রমুখ কবি ভাগবতের কয়েকটি স্কন্ধ ও পালা অবলম্বনে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক আখ্যানকাব্য লিখেছিলেন।

দুজন কৃষ্ণদাস ভাগবত অবলম্বনে দুটি কাব্য রচনা করেন - 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' ও 'গোবিন্দবিজয়'। কবিশেখর ভণিতাযুক্ত 'গোপালবিজয়' নামে যে-কাব্য পাওয়া গেছে সেটিও ভাগবত অনুসরণে রচিত।

কবিশেখরের কাব্যের অন্তর্ভূক্ত দানলীলা, দুঃখী শ্যামাদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল', দ্বিজ মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' প্রভৃতিতে গ্রামীণ কৃষ্ণকাহিনীর প্রভাব আছে।

ভাগবতকে অনুসরণ করে এই শতাব্দীতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যে রচনার পাশাপাশি সংস্কৃত রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এ যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুরা, বিশেষত সনাতন, রূপ, জীব ও গোপাল ভট্ট রচিত বৈষ্ণব কাব্য ও তত্ত্ব গ্রন্থগুলির কিছু কিছু সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলায় অনুবাদ হতে আরম্ভ করে। অনুবাদ হতে আরম্ভ করে। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। দ্বিজ কৃষ্ণদাস ভাগবত অবলম্বন যে দুটি কাব্য রচনা করেন সেগুলি কী কী?

উত্তর ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' ও 'গোবিন্দবিজয়'।

২। ভাগবতের অবলম্বনে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য রচনা করেন এমন কয়েকজন কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ কৃষ্ণদাস, দ্বিজ হরিদাস, অভিরাম দত্ত, দুর্লভ নন্দন, কবিচন্দ্র প্রমুখ।

৫.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। নাথসাহিত্য বলতে কী বোঝ?

২। গোরক্ষনাথ বৃত্ত এবং ময়নামতী বৃত্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৩। অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে রামায়ণের গুরুত্ব কতখানি আলোচনা করো।

৪। অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণব কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫.৮। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রমথ খণ্ড) - সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও মধ্যযুগের মুসলমান কবি

বিন্যাসক্রম

৬.১। বৈষ্ণব সাহিত্য

৬.২। বৈষ্ণব পদাবলী

৬.৩। বাংলায় ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি

৬.৪। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবি

৬.৫। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি

৬.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

৬.৭। সহায়ক গ্রন্থ

৬.১। বৈষ্ণব সাহিত্য

আচার্য ও কেন্দ্র ঃ-

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐশ্বর্য কিছু ম্লান হলেও কয়েকজন আচার্য এই ধর্ম ও মতাদর্শকে অতি দ্রুত সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষত বুদ্ধিজীবি মহলে ও অভিজাত বংশে জনপ্রিয় করে তোলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ। এই ত্রয়ী সাধক যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গে, উত্তরবঙ্গে ও ওড়িশায় মহাপ্রভুর আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

শ্রীনিবাস শুধু যে বীরহাম্বীরকে চৈতন্যধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন তা নয়। বহু দম্যু জমিদার ও ভক্তের দল তাঁর ভক্ত হয়ে জীবন ধন্য মনে করেছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ও কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্যের অন্যতম। শ্রীনিবাস খুব উচ্চস্তরের সাধকও ছিলেন।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় (দত্ত) শ্রীনিবাসের ঘনিষ্ঠ বান্ধব ছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই মহাপ্রভুর কথা শুনে তিনি বিষয়ভোগে নিরাসক্ত হয়ে পড়েন, তারপর সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বৃন্দাবনে এসে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্রাদি পড়তে থাকেন।

শ্যামানন্দের দ্বারা উৎকলে চৈতন্যধর্ম বিশেষ প্রচার লাভ করে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজে জন্মগ্রহণ করেও তিনি নিজ ভক্তি ও সাত্ত্বিক চরিত্রের দ্বারা বৈষ্ণব-সমাজে পূজার্হ - স্থান লাভ করেছিলেন। মন্তব্য

বর্ধমানের কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ড বা বৈদ্যখণ্ড গ্রাম মহাপ্রভুর সমকালেই বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। চৈতন্যের সমসাময়িক ও সেবক নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের জীবিতকালেই এই গ্রামের বৈষ্ণব-সমাজে মহাপ্রভু-কেন্দ্রিক একপ্রকার আদিরসাত্মক সাধনা, কাব্য, পদাবলীর সৃষ্টি করেন। এর নাম নাগরীভাব বা গৌরনাগর সাধন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। শ্রীনিবাসের দুজন শিষ্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ রামচন্দ্র কবিরাজ ও কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ।

২। নরোত্তম ঠাকুর কার কাছে ভক্তিশাস্ত্রাদি পড়তে থাকেন?

উত্তর ঃ লোকনাথ গোস্বামীর কাছে।

৩। শ্যামানন্দ কোথায় চৈতন্যধর্মের বিশেষ প্রচার করেছিলেন?

উত্তর ঃ উৎকলে।

৬.২। বৈষ্ণব পদাবলী

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মমত ও সমাজের অভূতপূর্ব শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের তাদৃশ উৎকর্ষ দেখা যায় না। মহাজন ও আচার্যেরা সাম্প্রদায়িক সংহতি ও প্রচারের দিকে এতটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, গভীর ভাববহ পদসাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির দিকে ততটা দৃষ্টি দিতে পারেননি।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম শ্যামানন্দ ঃ-

সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সমাজে এবং সাধারণভাবে সমগ্র বাংলা ও উৎকলে এঁদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। এঁরা তিনজনেই কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বৈষ্ণব

মন্তব্য

পদসংকলনে এঁদের কিছু কিছু পদও পাওয়া গেছে। ব্রজবুলিতে লেখা শ্রীনিবাসের দুচারটি পদের ধ্বনিঝংকার, রূপকল্প ও অলংকার সন্নিবেশ বেশ চমৎকার।

গোবিন্দ আচার্য ও গোবিন্দ চক্রবর্তী ঃ-

বৈষ্ণব সাহিত্যে চণ্ডীদাসের মতোই অনেক গোবিন্দ ছিলেন। কেউ কেউ নিজ উপাধিসহ ভণিতা দিয়েছেন, কেউ বা বৈষ্ণবীয় দীনতাবশত নামের সঙ্গে 'দাস' জুড়ে দিয়ে ছোট মাপের গোবিন্দদাস সমস্যা সৃষ্টি করেছেন।

রায়শেখর ঃ-

সপ্তদশ শতাব্দীতে ছোটো-বড়ো-মাঝারি অনেক পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছিল, অবশ্য বড়ো পদকর্তার সংখ্যা স্বতই অল্প। তিনি বৈচিত্র্য প্রয়াসী হয়ে নিজ নাম নানাভাবে ব্যবহার করতেন। যেমন - রায়শেখর, কবি শেখর রায়, কবিশেখর, শেখর কবি, শেখর রায় ইত্যাদি।

রায়বসন্ত ঃ-

গোবিন্দদাসের বন্ধু ও নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রায়বসন্ত বা বসন্তরায় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁকে কেউ কেউ রাজা প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্তরায় বলে মনে করেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-এ এঁর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত উল্লেখ আছে।

কবিরঞ্জন বা ছোটো বিদ্যাপতি ঃ-

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে 'কবিরঞ্জন' ভণিতাটি জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বিদ্যাপতি 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় পদ লিখতেন। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যের কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, কবিরঞ্জন ভণিতাযুক্ত যাবতীয় পদ বিদ্যাপতির রচনা। কবিরঞ্জনের সঙ্গে চণ্ডীদাসের রসতত্ত্ব আলাপ-বিষয়ক কয়েকটি পদ পাওয়া গেছে।

কয়েকজন অপ্রধান পদকর্তা ঃ-

'পদকল্পতরু' নামে বৈষ্ণব পদসংকলনগ্রন্থে কবিবল্লভ, বল্লভদাস, বিদ্যাবল্লভ ভণিতায় কিছু পদ পাওয়া গেছে।

মন্তব্য

শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দও কয়েকটি বাংলা পদ লিখেছিলেন। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র সংকলন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও গুটিকয়েক পদ লিখেছিলেন। পদসংকলন খুঁজলে আরো অনেক পদকারের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু এঁদের অনেকেই শুধু প্রথা পালনের জন্য কলম ধরেছিলেন, তাঁদের পদে অন্তরের প্রেরণা থাকলেও কবিত্ব ততটা ছিল না।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। শ্রীনিবাস কোন্ ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন?

উত্তর ঃ ব্রজবুলি ভাষায়।

২। রায়শেখর কী কী নাম ব্যবহার করেছিলেন?

উত্তর ঃ রায়শেখর, কবি শেখর রায়, কবিশেখর, শেখর কবি, শেখর রায় ইত্যাদি।

৩। কয়েকজন অপ্রধান পদকর্তার নাম লেখো।

উত্তর ঃ কবিবল্লভ, বল্লভদাস, বিদাবল্লভ, শ্যামানন্দ ইত্যাদি।

৬.৩। বাংলায় ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি

একসময় ইসলাম এসেছিল রণোন্মত্ত হুংকার দিয়ে, শাণিত অস্ত্র আস্ফালন করে, দুর্মদ অভিযানের অগ্নিজ্বালা ছড়িয়ে। পরে ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী গোটা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ধর্মান্তরীকরণের চণ্ডলীলা বয়ে চলল।

বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর ভারত থেকে উলেমা, পীর-ফকির-গাজী-শাহিদ, মুরশিদ প্রভৃতি মুসলিম অধ্যাত্মবাদীরা আসতে থাকেন।

অবশ্য বাংলাদেশের ইসলামি সংস্কৃতির মধ্যে অনেকগুলি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ দেখা যায়। চট্টগ্রাম ও আরাকান বহুদিন থেকে ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়েছিল। আরাকানি ও চট্টগ্রামী মুসলমানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নিজের প্রাণের ভাষা ও হৃদয়ের ধাত্রী বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন।

মন্তব্য

৬.৪। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবি

সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণে' করিম সাহেব সংগৃহীত মুসলমান কবিদের কাব্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হয়।

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে জৌনপুরের শাসক হুসেন শাহ্ শর্কী পুরাভূত হয়ে দলবল নিয়ে বাংলাদেশে এসে সুলতান হুসেন শাহের কাছে কিছুকাল বাস করেছিলেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশের গবেষকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে অন্তত তিনজন মুসলমান কবি কাব্য রচনা করেছিলেন ঃ ১. শাহ্ মুহম্মদ সগির, ২. জৈনুদ্দিন, ৩. মোজাম্মিল। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ সগিরের 'য়ুসুফ-জুলেখা'; জৈনদ্দিনের 'রসুলবিজয়' এবং মোজাম্মিলের নীতিশাস্ত্র, 'সয়ৎনামা' ও 'খঞ্জনচরিত্র' উল্লেখযোগ্য।

৬.৫। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি

সৈয়দ সুলতান, মহম্মদ খান, হাজি মহম্মদ - এঁরা সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

দৌলত কাজি ঃ-

সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত কবি দৌলত কাজির 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' রোমান্টিক আখ্যানকাব্য হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। আরাকানের সমরসচিব আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উপদেশে ১৬২১ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে হিন্দি কাব্য অবলম্বনে 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' রচনা করেন। এর বেশি কবি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো পরিচয় দেননি।

সৈয়দ আলাওল ঃ-

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের মধ্যে সৈয়দ আলাওল সর্বাধিক পরিচিত। আলাওল নানা বিষয় অবলম্বন করে কাব্য রচনা করে তাঁর প্রতিভার ব্যাপকতার পরিচয় দিয়েছেন - অবশ্য তাঁর কবিত্ব যে খুব উচ্চ স্তরের তা মনে হয় না।

মুসলমান সমাজে তাঁর অত্যাধিক জনপ্রিয়তার কারণ-তিনি ইসলামী কাহিনি ও নানাগ্রন্থ মূলক আরবি ও ফারসি থেকে অনুবাদ করেছিলেন। এগুলির তালিকা ঃ ১.

সয়ফলমূলক-বদিউজ্জমাল, ২. সপ্ত (হপ্ত) পয়কর, ৩. তোহ্‌ফা, ৪. সেকেন্দারনামা। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। দৌলত কাজীর কাব্যের নাম কী?

উত্তর ঃ 'সতীময়না' ও 'লোরচন্দ্রাণী'।

২। আলাওলের অনুবাদ গ্রন্থগুলি কী কী?

উত্তর ঃ ১. সয়ফলমূলক-বদিউজ্জমাল, ২. সপ্ত (হপ্ত) পয়কর, ৩. তোহ্‌ফা, ৪. সেকেন্দারনামা।

৬.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। মধ্যযুগের মুসলমান কবি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

৬.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-৭ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

বিন্যাসক্রম

৭.১। শাক্ত পদাবলী

৭.২। বাউল গান ও বাউল তত্ত্ব

৭.৩। গাথা ও গীতিকা

৭.৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

৭.৫। সহায়ক গ্রন্থ

৭.১। শাক্ত পদাবলী

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্য যে কটি ধারার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পেয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল শাক্ত পদাবলী সাহিত্য। শাক্ত পদাবলী শক্তি ও স্ত্রীদেবতার মাহাত্ম্যমূলক রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দী হল শাক্ত পদাবলীর সুবর্ণযুগ। এখানে আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতিকে কন্যারূপে ভজনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও পারিবারিক এক বিশেষ সঙ্কট মুহূর্তে গানগুলি রচিত। মোগল সাম্রাজ্যের রাজত্বের শেষদিকে ঔরঙ্গজেবের জীবিতকালেই ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় সংকট দেখা দেয়।

শাক্ত পদাবলী তৎকালীন সমাজের বাস্তবচিত্র। সমাজে নারী স্বাধীনতার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। শক্তিসাধকগণ তাঁদের গভীর মানসিক চেতনা দিয়ে সমকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের ভাবনাকে উপলব্ধি করেছেন।

শাক্ত পদাবলীর প্রধান রস বাৎসল্যরস।

পদাবলী সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উদার মানসিকতা। শাক্তসাহিত্যে স্ত্রীশক্তিকে শ্রেষ্ঠরূপে ভজন করা হয়েছে।

শাক্ত পদাবলীর কবিগণ

মন্তব্য

রামপ্রসাদ সেন ঃ-

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংবাদ প্রভাকর-এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামপ্রসাদ সম্পর্কে বহু তথ্য উদ্ধার করে ঐ পত্রিকায় তাঁর জীবনী প্রকাশ করেছেন। সংসার উদাসীন কবি একদিন হিসাবের খাতায় ''আমায় দেমা তবিলদারী'' গানটি লিখে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের বিরাগভাজন হন।

বাংলার শাক্তধর্মে এবং শাক্ত সাহিত্যে এক নতুন দিক খুলে দিয়েছিলেন এই সাধক কবি।

শ্যামামায়ের সঙ্গে তাঁর মা-ছেলের সম্পর্ক, কখনো মান-অভিমান, কখনো অভিযোগ- এই বাৎসল্যের প্রকাশ অচিন্তনীয়। আদ্যাশক্তিকে মর্ত্যজননীরূপে আঁকড়ে ধরতে খুব কম সাধকই পেরেছেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচর্য

শাক্ত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন মাতৃসাধক।

সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের অন্তর্গত অম্বিকাকালনা গ্রামে বসবাস করতেন।

শক্তিপদাবলীর দুটি ধারা - উমা সঙ্গীত অর্থাৎ আগমনী ও বিজয়া এবং শ্যামাসংগীত বা সাধনতত্ত্ব বিষয়ক কবিতা। এই দুটি ধারাই প্রবর্তন করেন ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ সেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত

মহেন্দ্রনাথ দত্ত সাধন সঙ্গীত রচনায় প্রেমিক গভীর হৃদয়ধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মন মাতৃচরণআশে ব্যাকুল, মায়া, মোহ, ভোগ, তৃষ্ণা পরিহার করে নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিয়ে তত্ত্বপথে ভ্রমণ করলে অরূপা রূন্ধরূপিনী অভয়পাণি সর্বনিদান মহাজননী মহাকালকে পাওয়া যায়।

মন্তব্য

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত সঙ্গীত বাউল ও শ্যামাগানের সমন্বয় ঘটেছে। বাউল সঙ্গীত ও মাতৃসঙ্গীত দ্বিবিধ রচনাতেই তিনি দক্ষ। তাছাড়া, তিনি 'বিষকুসুম' নামে একটি উপন্যাস এবং 'নলদময়ন্তী', 'উত্তরাবিলাপ', 'শল্যসংহার', 'ভক্তিভাণ্ডার' ইত্যাদি নাটকও রচনা করেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। শাক্তপদাবলীর তিনজন কবির নাম বলো।

উত্তর ঃ রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

৭.২। বাউল গান ও বাউল তত্ত্ব

বাউল শব্দের সাধারণ অর্থ হল উন্মত্ত বা পাগল। অভিধান বলছে যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা সংস্কার থেকে মুক্ত সাধক সম্প্রদায় বিশেষই বাউল।

বাউল গানের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এর আবির্ভাব লগ্ন কবে তা কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন যে ''বাংলা ভাষা আরম্ভ হইতেই বাউলের পরিচয় মেলে।''

ফকির পাঞ্জ শাহ ছিলেন উচ্চপর্যায়ের বাউল। তিনি মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলামী ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন।

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। তিনি এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব।

একজন বিশিষ্ট বাউল কবি হলেন গগন হরকরা যার গান একবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত সমাদৃত। গগন হরকরা শিলাইদহের মানুষ, যাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীহট্টের মানুষ হাসন রাজা বা লৌকিক উচ্চারণে হাছন রজা ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।

বাউলিয়া মতের অনেক উপাসক সম্প্রদায় আছে। বাউল গান লিখেছেন -

পদ্মলোচন বা পোদো, ফটিক গোঁসাই, যাদুবিন্দু, লালনশিষ্য দুদ্দু ও পাঁচু, চণ্ডী গোঁসাই, রশীদ, রাধাশ্যাম, গোঁসাই গোপাল, অনন্ত গোঁসাই ও অনেক দক্ষ শিল্পী। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বাউল শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ বাউল শব্দের অর্থ হল উন্মত্ত বা পাগল।

২। বাউল গান লিখেছেন এমন কয়েকজনের নাম লেখো।

উত্তর ঃ পদ্মলোচন, ফটিক গোঁসাই, যাদুবিন্দু, রাধাশ্যাম প্রমুখ।

৭.৩। গাথা ও গীতিকা

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কয়েকটি পালা বা গাথা বা গীতিকা আবিষ্কৃত হয় যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর সংযোজন। পালাগুলি মৈমনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে প্রকাশিত হয়।

কয়েকটি পালার লেখকদের নাম পাওয়া গেছে - ১. মহুয়া-দ্বিজ কানাই; ২. মলুয়া - অজ্ঞাত; ৩. চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র - নয়নচাঁদ ঘোষ; ৪. কমলা - দ্বিজ ঈশান; ৫. কেনারাম - চন্দ্রাবতী; ৬. ছুরত জামাল ও অধুয়া সুন্দরী - অন্ধ কবি ফকির ফৈজু; ৭. গোপিনীকীর্তন - স্ত্রী কবি মুলা গাইন; ৮. দেওয়ানা মদিনা - মনসুর বয়াতি; ৯. বিদ্যাসুন্দর - কবিকঙ্কণ; ১০. রামায়ণ - চন্দ্রাবতী ইত্যাদি।

সাহিত্য কোনো অবস্থাতেই বাস্তববিমুখ বা সমাজভাববিচ্যুত নয়। একথা যথাযথ যে সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প যার দর্পনে জীবন প্রতিফলিত। অবশ্যই "Art belongs to People" এই সব গাথাসাহিত্যের মধ্যে সেই জীবনসত্যই রূপ পেয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। গাথা বা গীতিকা পালাগুলি কী নামে প্রকাশিত?

উত্তর ঃ মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

২। দুটি পালার লেখকদের নাম লেখো।

মন্তব্য

উত্তর ঃ কেনারাম - চন্দ্রাবতী; দেওয়ানা মদিনা - মনসুর বয়াতি।

৭.৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। শাক্ত পদাবলী সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো।

২। বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করো।

৩। গাথা ও গীতিকা সাহিত্য বা লোকসাহিত্য বলতে কী বোঝ?

৭.৫। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।